পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

প্রমাণ ও মুজিজার বিশ্বকোষ

মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ

বৈজ্ঞানিক মুজিজা · ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য · সত্য হয়ে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

তাওরাত ও ইনজিলের সুসংবাদ · জিন, জাদু ও অদৃশ্যের জগৎ

শিশুও বুঝতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা · 157টি রঙিন চিত্র

157টি প্রমাণ, শক্তি অনুসারে সাজানো

প্রথম পর্ব

মহান প্রমাণসমূহ

বইয়ের হৃদয়: আকাশে, পৃথিবীতে, মানুষের দেহে আর ইতিহাসের নথিতে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনগুলো এক পর্বে একত্র করা এবং **সবচেয়ে প্রবল প্রমাণ থেকে সবচেয়ে হালকা প্রমাণ পর্যন্ত ক্রমে সাজানো**। সবার আগে যা পড়বেন সেটিই সেই প্রমাণ যা থেকে বেরোনোর কোনো পথ নেই; আর পর্বে যত এগিয়ে যাবেন, প্রমাণের ভার ততই কিছুটা হালকা হতে থাকবে।

81 প্রমাণ

ভ্রূণবিদ্যা

1 পাঁচটি স্তর — আর ঠিক সেই ক্রমেই

অতঃপর আমি সেই শুক্রবিন্দুকে আলাকা বানালাম, তারপর আলাকাকে মুদগা বানালাম, তারপর মুদগাকে হাড় বানালাম, তারপর হাড়গুলোকে মাংস দিয়ে ঢেকে দিলাম।

সূরা আল-মুমিনুন — আয়াত 14

কার্নেগি স্তর ও বাস্তব ভ্রূণের আলোকচিত্র থেকে আঁকা — একই অনুপাত, একই মাপ। স্তরগুলো নাম ধরে ও ক্রম অনুযায়ী, ঠিক যেমন আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ্যবই দেয়

সহজ কথায়

পাঁচটি স্তর, যাদের কুরআন চৌদ্দ শতাব্দী আগে নাম ধরে ডেকেছে: এক ফোঁটা পানি, তারপর **আলাকা** — এমন কিছু যা জরায়ুর দেয়ালে আটকে যায়, তারপর ডালে ঝোলা ফলের মতো তাতে ঝুলে থাকে; তারপর **মুদগা** — ছোট্ট এক টুকরা, যার গায়ে খাঁজ, **যেন দাঁতে চিবানো হয়েছে**; তারপর হাড়, যা গড়ে তোলা হয়; তারপর মাংস, যা হাড়কে ঢেকে দেয়। উপরের ছবিটি **খোদ ভ্রূণের আলোকচিত্র থেকে নেওয়া** — নিজের চোখে দেখুন, তারপর ফিরে গিয়ে আয়াতটি আরেকবার পড়ুন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জরায়ুর ভেতরে কী ঘটে, তার কিছুই জানা ছিল না। প্রচলিত মত — অ্যারিস্টটলের, আর তাঁর পরে সবার — ছিল এই যে ভ্রূণ গঠিত হয় **জমাট বাঁধা মাসিকের রক্ত** থেকে। গ্যালেন ভ্রূণ গঠনকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মাংস **হাড়ের উপরে ও তার চারপাশে গজায়** — কিন্তু তিনি কখনো কোনো মানুষের জরায়ু খোলেননি; এসব তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন পশুর ব্যবচ্ছেদ আর তাত্ত্বিক অনুমানের উপরে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আলাকা — মোটামুটি প্রথম দুই সপ্তাহ: তিনটি প্রমাণিত ঘটনা একসঙ্গে ঘটে: ভ্রূণ-থলিটি **জরায়ুর দেয়ালে আটকে যায় ও তাতে ঢুকে পড়ে**, যতক্ষণ না টিস্যুর ভেতরে পুরোপুরি ডুবে যায়; তারপর তা **নিজের থলির ভেতরে একটি সংযোগকারী বৃন্ত ধরে ঝুলে থাকে** — উপরের ছবিতে আপনি এটিই দেখছেন; আর তার চারপাশে **ফাঁকা জায়গা খুলে যায়, যা মায়ের রক্তে ভরে ওঠে**, ফলে সে রক্তে ঘেরা হয়ে পড়ে।

মুদগা — মোটামুটি চতুর্থ সপ্তাহ: ভ্রূণের পিঠে **সোমাইট** নামের খণ্ডগুলো ফুটে ওঠে, একটির পর একটি যুক্ত হতে থাকে প্রায় চল্লিশ জোড়া পর্যন্ত, আর তাদের মাঝে গভীর খাঁজ, ফলে তার পিঠ দেখায় খাঁজকাটা — আর তখন তার দৈর্ঘ্য তিন মিলিমিটার, বিবর্ধন ছাড়া যা চোখেই পড়ে না।

তারপর হাড়, তারপর মাংস: কঙ্কাল প্রথমে তরুণাস্থির ছাঁচ হিসেবে গড়ে ওঠে, তারপর পেশি তার চারপাশে জড়িয়ে যায় আর তার থেকেই নিজের আকার নেয় — আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো কিছুর উপরে পোশাক, ঠিক যেমনটি তিনি বলেছেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই দুটি শব্দের কাছে একটু থামুন, হালকাভাবে পেরিয়ে যাবেন না। **মাত্র দুটি শব্দ** — "আলাকা" আর "মুদগা" — এমন কিছু বর্ণনা করেছে, যার উপরে চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো মানুষের চোখ পড়েনি; আর তারপর পড়েছে কেবল অণুবীক্ষণ ও ক্যামেরার মাধ্যমে।

প্রথমটি: "আলাকা"। এটি আমার কাছ থেকে নেবেন না — অভিধান থেকেই নিন। জাওহারি, যিনি মারা গেছেন **এক হাজার বছর আগে**, তাঁর আস-সিহাহ গ্রন্থে লিখেছেন: "**আর আলাকা হলো পানির সেই কীট, যা রক্ত চুষে খায়।**" হুবহু একই কথা আছে লিসানুল আরবেও। আর মূল ধাতুটি নিজেই ঘোরে **আটকে যাওয়া ও লেগে থাকার** অর্থে, আর **ঝুলে থাকা ও লটকে থাকার** অর্থে।

এবার চোখ তুলুন পাতার উপরের ছবিটির দিকে। কী দেখছেন? দেখছেন এমন এক সত্তাকে, যে জরায়ুর দেয়ালে **আটকে গেছে** আর তাতে ঢুকে গেছে, যতক্ষণ না তার মাংসে ডুবে যায়; তারপর নিজের থলির ভেতরে একটি বৃন্ত ধরে **ঝুলে আছে**, যেমন ডাল থেকে ঝোলে ফল; আর **তার মায়ের রক্ত তাকে ঘিরে রেখেছে** সব দিক থেকে। একটি নাম তিনটিকেই ছুঁয়ে গেল। **তাহলে কে তাঁকে জানাল?**

দ্বিতীয়টি: "মুদগা"। এটি এসেছে **চিবানো** থেকে। লিসানুল আরবে উদ্ধৃত খালিদ ইবনে জানবার কথা: "**মাংসের মুদগা হলো মানুষ নিজের মুখে যতটুকু দেয় ততটুকু**" — এক গ্রাস, যা চিবানো হয়। তারপর চৌদ্দ শতাব্দী পরে আসে অণুবীক্ষণ, আর চতুর্থ সপ্তাহের ভ্রূণের ছবি তোলে; আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান বলে, এই খণ্ডগুলো তার পিঠ বরাবর **বাইরে থেকে পুঁতির মতো উঁচু দেখায়**, আর তাদের মাঝে গভীর খাঁজ। ছবিটির দিকে তাকান: যেন দুই চোয়ালের মাঝে চেপে ধরা হয়েছে! আর মনে রাখুন, তখন তার দৈর্ঘ্য **তিন মিলিমিটার** — চোখে দেখা যায় না, আর সেদিন যা সৃষ্টিই হয়নি, সেই বিবর্ধন ছাড়া তার আকার জানারও উপায় নেই।

আর তৃতীয়টি: হাড়, তারপর মাংস। কোন মানুষ এক নরম পিণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলবে: হাড় আগে?! বুদ্ধি তো উল্টোটাই বলে। কিন্তু বিজ্ঞান বলে: কঙ্কালই আগে গড়া হয়, তারপর পেশি তার চারপাশে জড়িয়ে যায় আর তার থেকেই আকার নেয়। আর এ তো হুবহু তাঁরই কথা: "**তারপর হাড়গুলোকে মাংস দিয়ে ঢেকে দিলাম**" — আর ঢাকা তো কেবল আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা কিছুর উপরেই হয়!

একটি আয়াতে পরপর চারটি শব্দ। **পরপর চারটি আঘাত।** এর যেকোনো একটি ভুল হলেই তা একাই এই গ্রন্থ ভেঙে ফেলার জন্য যথেষ্ট ছিল — অথচ একটিও ভুল হয়নি। মরুভূমির এক নিরক্ষর মানুষ, যিনি পড়তে জানেন না লিখতেও জানেন না, চোখে দেখা যায় না এমন স্তরগুলোর নাম বলছেন... আর একটি একটি করে প্রতিটিতেই ঠিক লাগছেন। **তাহলে কে তাঁকে শেখাল?**

সূত্র Moore & Persaud — *The Developing Human*; O'Rahilly & Müller — *Developmental Stages in Human Embryos*, 1987

গভীর সমুদ্র

২ অন্ধকার, একটির উপরে আরেকটি

অথবা যেন গভীর সমুদ্রের অন্ধকার, যাকে ঢেকে রেখেছে এক ঢেউ, তার উপরে আরেক ঢেউ, তার উপরে মেঘ — অন্ধকার, একটির উপরে আরেকটি।

সূরা আন-নূর — আয়াত 40

আলো স্তরে স্তরে গ্রাস হয়ে যায়, আর এক হাজার মিটারের নিচে তা পুরোপুরি মিলিয়ে যায়

সহজ কথায়

সমুদ্রের গভীরে অন্ধকারের উপরে অন্ধকার: আগে মেঘ আড়াল করে, তারপর ঢেউ আড়াল করে, তারপর পানি রঙগুলোকে একটি একটি করে গিলে নেয়, শেষে এতটুকু আলোও আর থাকে না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

নিঃশ্বাস আটকে কোনো মানুষ কয়েক মিটারের বেশি গভীরে নামেনি। সমুদ্রের গভীর ছিল সম্পূর্ণ অজানা। সেখানকার অন্ধকার যে **স্তরে স্তরে সাজানো**, তা কেউ জানত না; দৃশ্যমান ঢেউয়ের নিচে যে চোখে না-পড়া আরেকটি ঢেউ আছে, তা-ও কেউ জানত না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পানিতে আলো ধাপে ধাপে শোষিত হয়: লাল মিলিয়ে যায় প্রায় 15 মিটারে, তারপর কমলা, তারপর হলুদ, তারপর সবুজ; কেবল ক্ষীণ নীল টিকে থাকে, প্রায় 200 মিটারে সেটিও নিভে যায়। এক হাজার মিটারের নিচে **নিরেট অন্ধকার, একটি ফোটনও নেই**। বিজ্ঞান **অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ**ও আবিষ্কার করেছে, যা ভিন্ন ঘনত্বের পানির স্তরগুলোর সীমানা বরাবর চলে — ঢেউয়ের নিচের ঢেউ।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি তিনটি পর্দাকে উপর থেকে নিচে সঠিক ক্রমে সাজিয়েছে: মেঘ, তারপর ঢেউ, তারপর **তার নিচে আরেকটি ঢেউ**। সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে দ্বিতীয় একটি ঢেউয়ের অস্তিত্ব এমন সত্য, যা বিশ শতকের আগে জানাই ছিল না। এরপর তা শেষ হয় সর্বব্যাপী বর্ণনায়: "অন্ধকার, একটির উপরে আরেকটি" — অর্থাৎ **স্তরে স্তরে চাপানো অন্ধকার**, একক কোনো অন্ধকার নয়। পানিতে আলোর শোষণের ঠিক এটিই নিখুঁত ভৌত বর্ণনা।

সূত্র Sverdrup, Johnson & Fleming — *The Oceans*, 1942 · NOAA — light in the ocean

আবহাওয়াবিজ্ঞান

3 বৃষ্টি তৈরির তিন ধাপ

আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ মেঘকে সঞ্চালিত করেন, তারপর তাদের পরস্পর জোড়া লাগান, তারপর তাকে স্তূপীকৃত করেন, অতঃপর আপনি দেখতে পান তার ফাঁক থেকে বৃষ্টি বেরিয়ে আসছে?

সূরা আন-নূর — আয়াত 43

সঞ্চালন, তারপর সংযোজন, তারপর খাড়া স্তূপীকরণ — আর তখনই বৃষ্টি নামে

সহজ কথায়

বৃষ্টি হুট করে নেমে আসে না। তার তিনটি ধাপ আছে, ক্রম মেনে: বাতাস ছোট ছোট মেঘখণ্ডকে **হাঁকিয়ে আনে**, তারপর সেগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে **জুড়ে দেয়**, তারপর একটির উপরে আরেকটি পাহাড়ের মতো **স্তূপ করে** — আর তখনই বৃষ্টি হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বৃষ্টি ছিল একটিমাত্র ঘটনা: মেঘ, তারপর পানি। মেঘের যে **পর্যায়ক্রমিক গঠন-ধাপ** আছে, তা কেউ জানত না; বর্ষণকারী মেঘ যে গড়নে অ-বর্ষণকারী মেঘ থেকে আলাদা, তা-ও জানত না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কিউমুলোনিম্বাস মেঘের জন্ম নিয়ে আবহাওয়াবিজ্ঞান ঠিক এটিই শেখায়: বায়ুপ্রবাহ ছোট ছোট মেঘকোষকে হাঁকিয়ে এক করে আনে, তারপর কোষগুলো মিশে এক হয়ে যায়, তারপর সেই পিণ্ড স্তরে স্তরে খাড়াভাবে বাড়তে থাকে, যা 15 কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে। **কেবল এই ধাপে এসেই** ফোঁটাগুলো পড়ার মতো যথেষ্ট বড় হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ক্রম ও ব্যবধান বোঝানো অব্যয় দিয়ে জোড়া তিনটি পরপর ক্রিয়া: “সঞ্চালিত করেন” (আলতো করে হাঁকিয়ে নেন) → “পরস্পর জোড়া লাগান” (খণ্ডগুলো মেলান) → “স্তূপীকৃত করেন” (খাড়াভাবে থাকে থাকে সাজান)। এ এমন এক ক্রম, যাকে **না উল্টানো যায়, না সংক্ষিপ্ত করা যায়**, আর এটিই হুবহু বৈজ্ঞানিক ক্রম। এরপর আসে শেষ সূক্ষ্মতা: বৃষ্টি বেরোয় **“তার ফাঁক থেকে”** — অর্থাৎ পিণ্ডের ভেতরের ফাঁকফোকর ও ভাঁজ থেকে, তার নিচ থেকে নয়। রাডারের ছবি ঠিক তা-ই দেখায়।

সূত্র World Meteorological Organization – *International Cloud Atlas* · NOAA – thunderstorm basics

জ্যোতির্বিজ্ঞান

4 “পুরোনো খেজুর-ডাঁটার মতো” — চাঁদের জন্য দেওয়া সবচেয়ে নিখুঁত উপমা

আর চাঁদ — আমি তার জন্য মনযিল নির্ধারণ করেছি, শেষে সে পুরোনো খেজুর-ডাঁটার মতো হয়ে ফিরে আসে।

সূরা ইয়াসিন — আয়াত 39

দুই শব্দে চারটি বৈশিষ্ট্য: বাঁকা, সরু, হলুদ, আর চক্রের শেষে

সহজ কথায়

উরজুন হলো সেই ডাঁটা, যাতে খেজুরের কাঁদি ঝোলে। পুরোনো হলে তা **শুকিয়ে যায়, সরু হয়ে যায়, বেঁকে যায় আর হলদে হয়ে পড়ে**। মাসের শেষের চাঁদকে কুরআন এরই সঙ্গে তুলনা করেছে — আর ঠিক তখনই সে হয়ে ওঠে সরু, বাঁকা, ফ্যাকাশে এক সুতো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

চাঁদের দশা তো সবাই দেখে, তাই প্রশ্নটা এই নয় যে চাঁদ ক্ষয়ে যায় তা তিনি জানতেন। প্রশ্নটা **বর্ণনার সূক্ষ্মতা আর উপমার বস্তুটি বেছে নেওয়ার**। আরবরা তাদের কবিতায় বাঁকা চাঁদকে বহু কিছুর সঙ্গে তুলনা করেছে — কাস্তের সঙ্গে, ছোট নৌকার সঙ্গে, নখের কাটা টুকরোর সঙ্গে — আর এদের প্রত্যেকটি ধরতে পারে কেবল একটি বৈশিষ্ট্য: **বাঁক**। রং ধরতে পারে না, শুষ্কতাও নয়, চক্রের কোন জায়গায় দশাটি পড়ছে তাও নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

চান্দ্রমাস **29.5 দিনের**, আর চাঁদ তা পার হয় গোনা কয়েকটি মনযিলে, যেগুলো থেকে সে কখনো সরে না; প্রতি রাতে তার আকৃতি **তার অবস্থানেরই** ফল, তার ভিতরের কোনো কিছুর নয়। আর মাসের শেষে তার আলোকিত অংশ নেমে আসে **1%-এরও নিচে**, তখন সে হয়ে যায় অতি সরু এক চাপ, যার দুই প্রান্ত সরু হতে হতে মিলিয়ে যায়।

এরপর এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা কেবল পর্যবেক্ষকের চোখেই ধরা পড়ে: মাসের শেষের বাঁকা চাঁদ **ভোরের ঠিক আগে পূর্ব দিগন্তের কাছাকাছি ছাড়া দেখাই যায় না** — আকাশের মাঝখানে কখনোই নয়। আর দিগন্তের কাছ থেকে আসা আলো বাতাসের এক পুরু স্তর পেরোয়, যা নীলকে আটকে দেয় আর হলুদ ও লালকে যেতে দেয় — **তাই তাকে দেখায় ফ্যাকাশে হলুদ**। আর সেটিই শুকনো খেজুর-ডাঁটার রং, হুবহু।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উপমাটির ভিতরে যত শর্ত ভরা আছে, সব একসঙ্গে সাজান: **বাঁকা**, **সরু, দুই প্রান্ত সরু হয়ে আসা**, **ফ্যাকাশে হলুদ**, আর **চক্রের শেষে, শুরুতে নয়**। দুই শব্দে চারটি শর্ত, আর প্রতিটিই লেগে যায়।

চতুর্থটিই সবচেয়ে সূক্ষ্ম। কুরআন *হিলাল* বলেনি — যা মাসের শুরুর বাঁকা চাঁদের চলতি নাম — বরং বলেছে **“ফিরে এলো”**, অর্থাৎ আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই ফিরে এলো; আর উপমার বস্তুটিকে বলেছে **“পুরোনো”**। ফলে পুরোনোর সঙ্গে মিলল পুরোনো, আর ফিরে আসার সঙ্গে মিলল চক্র। এ কারণেই তাফসিরকারগণ, যখন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কিছুই জানা ছিল না, বলেছেন: এ হলো মাসের শেষের চাঁদ, **তার লুকিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে**।

আর উপমার বস্তুটি কারও থেকে দূরে ছিল না: **মদিনার প্রতিটি ঘরে একটি করে খেজুর-ডাঁটা**। উপমাটি গোটা আরবের প্রতিটি চোখের সামনে খোলা পড়ে ছিল, আর একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যেও যদি ভুল হতো, বিরোধীদের কবিরা সেদিনই তা লুফে নিত — তারা এর চেয়ে হালকা জিনিস নিয়েও খোঁটা দিয়েছে। তাদের কারও কাছ থেকে এই একটি অক্ষর নিয়েও কোনো আপত্তি বর্ণিত হয়নি।

আর একটি সীমায় থামুন: আমরা দাবি করছি না যে আয়াতটি দশা বদলের *কারণ* শেখাচ্ছে; অ্যানাক্সাগোরাস খ্রিষ্টপূর্ব চার শতাব্দী আগেই স্থির করেছিলেন যে চাঁদ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। আমরা যা বলছি তা আরও সংকীর্ণ ও আরও মজবুত: **দুই শব্দের একটি বর্ণনা চারটি ভিন্ন ভিন্ন ভৌত বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে ধরেছে** — আকৃতি, রং, সরুতা আর চক্রে অবস্থান — আর প্রতিটিতেই লেগে গেছে। এ কাজ ভাগ্যের জোরে হয় না।

সূত্র تفسير ابن كثير – سورة يس، ٣٩ · تفسير الطبري – سورة يس، ٣٩ · NASA Science – *Moon Phases* · FAO – *Botanical Description of the Date Palm* · Stanford Encyclopedia of Philosophy – *Anaxagoras*

5

শারীরস্থান

তিনশ ষাটটি অস্থিসন্ধি — ব্যবচ্ছেদের আগেই গোনা

❖ বনি আদমের প্রত্যেক মানুষকে তিনশ ষাটটি অস্থিসন্ধির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। ❖

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আয়েশা থেকে — সহিহ · বুরাইদা থেকে সহিহ সমর্থক বর্ণনাসহ

যেখানেই দুটি হাড় মিলিত হয়... গোনা ও নাম দেওয়া

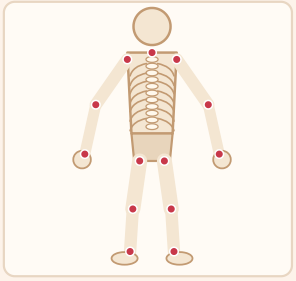

147	মেরুদণ্ড
24	বক্ষপিঞ্জর
86	দুই উর্ধ্বাঙ্গ
88	দুই নিম্নাঙ্গ
15	শ্রোণি
360 অস্থিসন্ধি	

স্পষ্ট এক সংখ্যা, যার কোনো ব্যাখ্যান্তর চলে না — প্রথম নির্ভুল শারীরস্থান-মানচিত্রের নয় শতাব্দী আগে বলা

সহজ কথায়

আপনার শরীরে আছে **তিনশ ষাটটি অস্থিসন্ধি** — এটিই মূল সংখ্যা, মানুষভেদে যা সামান্য বাড়ে বা কমে। নবী ﷺ চৌদ্দ শতাব্দী আগে এ কথা বলেছেন, আর তার প্রতিটি সন্ধির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন **প্রতিদিন আদায় করার মতো একটি সদকা**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরব উপদ্বীপে ব্যবচ্ছেদও ছিল না, চিকিৎসাবিদ্যার কোনো পাঠশালাও ছিল না; আর অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতায় মানুষের দেহ ব্যবচ্ছেদ করা ছিল নিষিদ্ধ — এতটাই যে **গ্যালেন** তাঁর শারীরস্থান দাঁড় করিয়েছিলেন বানর ও শূকরের উপর।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

শরীরের সন্ধিগুলো একটি একটি করে গোনা হয়েছে — যেখানেই দুটি হাড় মিলিত হয়, তা নড়ুক বা না নড়ুক — ডা. **হামিদ আহমাদ হামিদ**-এর দেওয়া বিভাজন অনুযায়ী: **মেরুদণ্ড 147**, **বক্ষপিঞ্জর 24**, **দুই ঊর্ধ্বাঙ্গ 86**, **দুই নিম্নাঙ্গ 88**, আর **শ্রোণিচক্র 15**। সব মিলিয়ে: **তিনশ ষাট**।

গণনা নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপর: সংজ্ঞা আর দেহ। যিনি কেবল নড়নশীল সন্ধিগুলো গুনবেন, তাঁর সংখ্যা কম পড়বে। আবার দেহগুলোও পরস্পর থেকে সামান্য আলাদা: প্রায় 26% মানুষের থাকে **অতিরিক্ত ক্ষুদ্রাস্থি**, 15%-এর **অন্তর্বর্তী কশেরুকা**, আর 8%-এর **তিলাস্থি**। তাই **সুস্থ দেহে তিনশ ষাটই মূল সংখ্যা**, প্রতিটি মানুষে অভিন্ন কোনো অনড় গণনা নয়। আর প্রথম নির্ভুল শারীরস্থান-মানচিত্র এসেছে 1543 সালে, **ভেসালিয়াস**-এর হাতে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, এই সংবাদটি কোন ধরনের: এটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ কোনো বর্ণনা নয়, কোনো উপমাও নয় — এটি একটি **সংখ্যা**; হয় তা মিলবে, নয় তা ভেঙে পড়বে। নিরাপদ থাকতে চাইলে তিনি বলতে পারতেন "অনেক সন্ধি"। কিন্তু তিনি বললেন: **তিনশ ষাট** — এমন এক দেহ সম্পর্কে যা কখনো খোলা হয়নি, এমন এক উপদ্বীপে যেখানে ছুরিও নেই, চিকিৎসার পাঠশালাও নেই।

আর সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, সংখ্যাটি নিজের জন্য বলা হয়নি, বলা হয়েছে এক বিধানের প্রসঙ্গে: এর প্রতিটি সন্ধির উপর **প্রতিদিন একটি করে সদকা** রয়েছে। সংখ্যাটি বিধানের ভার বহন করছে, বাক্যের অলংকার নয়; ভুল হলে বিধানও তার সঙ্গে ভেঙে পড়ত।

বলা হতে পারে: হয়তো উদ্দেশ্য আঙুলের হাড়, কেননা ভাষায় *সুলামা*-র মূল অর্থ তো তা-ই। হাদিসটি নিজেই এর মীমাংসা করে দেয়: তিনি ﷺ বলেছেন, তিনশ ষাটটি **মাফসিল**-এর উপর — অর্থাৎ সন্ধি — তারপর সেই একই বাক্যে সেই একই সংখ্যাকে বললেন **"সুলামা"**। একটিমাত্র পাঠে একই গণনার জন্য দুটি শব্দ — **সুতরাং হাদিসই *সুলামা*-কে সন্ধি বলে ব্যাখ্যা করেছে**। আর মাফসিল মানে দুটি হাড়ের মিলনস্থল, এতে কোনো মতভেদ নেই; এ কারণেই সহিহ মুসলিমের ইংরেজি অনুবাদগুলো একে *joints* — দেহের সন্ধি — বলেই অনুবাদ করে, আঙুলের হাড় নয়।

এরপর বলা হতে পারে: হয়তো তা তাঁর কাছে পৌঁছেছে চীনা চিকিৎসা থেকে। আমরা কথাটি যেমন আছে তেমনই বলি: হ্যাঁ, সংখ্যাটি চীনের প্রাচীন গ্রন্থে আছে — *লিংশু* বলে: "বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন, আর দেহে তিনশ ষাটটি সন্ধি।" আর গ্রন্থটি নিজেই বলে দেয় সংখ্যাটি কোথা থেকে এসেছে: **পঞ্জিকা** থেকে, দেহ থেকে নয়। তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়: এসব **আরব মরুভূমির এক নিরক্ষর মানুষের** কাছে পৌঁছাবে কী করে? পৌঁছানোর কোনো পথই ছিল না — মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি বাধা:

1 — কোনো পথ নেই। চীনে পৌঁছানো প্রথম মুসলিম দূতদল যায় 651 খ্রিস্টাব্দে — নবী ﷺ-এর ওফাতের উনিশ বছর পর।

2 — কোনো অনুবাদও নেই। চীনা চিকিৎসার প্রথম যে গ্রন্থ কোনো ভাষায় বেরোয়, তা হলো *তানসুকনামা*, 1313 খ্রিস্টাব্দে — হাদিসের সাত শতাব্দী পরে।

3 — আর গ্রন্থটি নিজেই হারিয়ে গিয়েছিল। *লিংশু* চীন থেকেই হারিয়ে যায়, শেষে সং রাজদরবার 1091 খ্রিস্টাব্দে কোরিয়ার কাছে তার একটি প্রতিলিপি চেয়ে পাঠায় এবং 1093 সালে তা হাতে পায় — অর্থাৎ হাদিসের **সাড়ে চার শতাব্দী পরে**।

এক নিরক্ষর মানুষ, যিনি কোনোদিন কোনো দেহ খোলেননি, তাঁর উম্মাহকে দিয়ে গেলেন একটি শারীরস্থানগত সংখ্যা এবং তার উপর দাঁড় করালেন একটি ইবাদত… তারপর নয় শতাব্দী পরে আধুনিক ব্যবচ্ছেদ গুনে দেখল সংখ্যাটি ঠিক সেটিই। **তাহলে কে তাঁর হয়ে সেগুলো গুনে দিয়েছিল?**

সূত্র صحيح مسلم ١٠٠٧ – «مُفصل» و«سُلامي» في نصٍّ واحد · Cleveland Clinic – *Joints* · Stanford Encyclopedia of Philosophy – *Chinese Philosophy and Chinese Medicine* · د. حامد أحمد حامد – «رحلةُ الإيمان في جِسم الإنسان» – Köstenbauer, *ANZ J. Surg.* 2017 · رشيد الدين – «تَنكسوق نامه»، ١٣١٣م

ভ্রূণবিজ্ঞান

6 লেজের হাড় — এ থেকেই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে

আদম-সন্তানের সবকিছুই মাটি খেয়ে ফেলে, শুধু লেজের হাড়টুকু ছাড়া; তা থেকেই সে সৃষ্টি হয়েছে এবং তা থেকেই তাকে পুনরায় গড়া হবে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

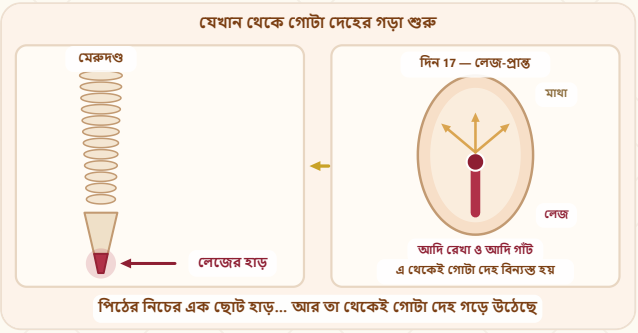

আদি রেখা ফুটে ওঠে ভ্রূণের লেজ-প্রান্তে, আর তা থেকেই গড়ে ওঠে সব অক্ষ ও সব স্তর

সহজ কথায়

লেজের হাড় হলো **মেরুদণ্ডের একেবারে নিচের ছোট্ট হাড়টি**। নবী ﷺ বলেছেন, মানুষ **তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে**। আর ভ্রূণবিজ্ঞান আজ বলে: গোটা দেহের নির্মাণ শুরু হয় **ভ্রূণের লেজ-প্রান্তে ফুটে ওঠা একটি রেখা** থেকে, যার শীর্ষে থাকে **অর্গানাইজার** নামে একটি গাঁট — সেখান থেকেই বিন্যস্ত হয় তিনটি জননস্তর ও দেহের সব অক্ষ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ভ্রূণের প্রথম পর্যায় সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না; তা দুই মিলিমিটারেরও ছোট, কোনো চোখ তা ধরতে পারে না। আর কক্কিক্স বা লেজের হাড়কে দেখা হতো **কাজহীন এক উদ্‌বৃত্ত** হিসেবে — সংকুচিত একটি লেজ; এতটাই যে ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীরা একে ঠাঁই দিয়েছিলেন অকেজো "অবশেষ অঙ্গের" তালিকায়। ঠিক এই জায়গাটিকেই **সৃষ্টির উৎস** বলা সাধারণ বোধের বিরুদ্ধে যায়: বুদ্ধি তো শুরু করে মাথা কিংবা হৃৎপিণ্ড দিয়ে, পিঠের নিচের প্রান্ত দিয়ে নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সপ্তদশ দিনে ভ্রূণ-চাকতিতে ফুটে ওঠে একটি রেখা, যার নাম **আদি রেখা**, আর তার অবস্থান ভ্রূণের **লেজ-প্রান্ত**। তার শীর্ষে থাকে **আদি গাঁট**, ভ্রূণবিজ্ঞানে যাকে বলা হয় **অর্গানাইজার**: এটিই দুই পাশের প্রতিসাম্য দাঁড় করায়, গ্যাস্ট্রুলেশন কোথায় ঘটবে তা নির্ধারণ করে, তিনটি জননস্তরের সূচনা ঘটায় এবং দেহের অক্ষগুলো এঁকে দেয় — মাথা থেকে লেজ, ডান থেকে বাম।

স্পেমান ও মানগোল্ড 1924 সালে প্রমাণ করেন, সালামান্ডারের ভ্রূণে এই গাঁটের সমতুল্য **ব্লাস্টোপোরের পৃষ্ঠীয় ঠোঁট**টুকু আলাদা করে অন্য একটি ভ্রূণে বসিয়ে দিলে গ্রহীতা ভ্রূণের নিজের কোষগুলোই গড়ে তোলে **দ্বিতীয় একটি ভ্রূণ-অক্ষ** — তার স্নায়ুনালি, পৃষ্ঠরজ্জু ও সোমাইটসহ — আর এর জন্যই স্পেমান 1935 সালে নোবেল পান।

এরপর রেখাটি গুটিয়ে আসে এবং বিংশ দিনে তার অবশিষ্টাংশ হয়ে যায় **লেজ-কুঁড়ি**। আর তার একটি পরিচিত চিকিৎসাগত সম্পর্ক থেকে যায়: **স্যাক্রোককসিজিয়াল টেরাটোমা** নামের টিউমারটিকে আদি রেখার অবশেষের সঙ্গেই সম্পর্কিত করা হয়, আর তার অস্ত্রোপচারে কেবল টিউমার কেটে ফেলাই যথেষ্ট নয় — **কক্কিক্সটিও তার সঙ্গে কেটে বাদ দেওয়া হয়**, কারণ ওটি রেখে দিলেই টিউমার ফিরে আসে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

শুধু অব্যয়টির দিকে তাকান। বলা হয়নি "তার মধ্যে সে সৃষ্টি হয়েছে", বলা হয়নি "তা অন্যদের আগে সৃষ্টি হয়েছে", বলা হয়েছে **"তা থেকেই সে সৃষ্টি হয়েছে"** — অর্থাৎ জায়গাটিকে করা হয়েছে এমন এক **উৎস**, যা থেকে নির্মাণ বেরিয়ে আসে। আর অর্গানাইজারের বর্ণনা ঠিক এটিই: এটি প্রথম গড়ে ওঠা অঙ্গ নয়, বরং সেই জায়গা **যেখান থেকে** বাকি অঙ্গগুলো বিন্যস্ত হয়।

এবার যে জায়গাটি বেছে নেওয়া হলো তার দিকে তাকান: পিঠের নিচের প্রান্ত। সপ্তম শতাব্দীর পর্যবেক্ষণে এমন কিছুই নেই যা একে সৃষ্টির উৎস বলতে উদ্‌বুদ্ধ করে, বরং সবকিছুই মনকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়। আর কারও পক্ষে তা দেখা সম্ভবও ছিল না: সপ্তদশ দিনের ভ্রূণ খালি চোখে ধরার পক্ষে অনেক ছোট।

আর এখানে আমরা এমন এক সীমায় থামছি, যা বলে দেওয়া উচিত। হাদিসের দ্বিতীয় অংশ — "**এবং তা থেকেই তাকে পুনরায় গড়া হবে**" — পুনরুত্থান সম্পর্কে সংবাদ, যা গায়েবের বিষয়; কোনো পরীক্ষা সেখানে পৌঁছায় না, আর আমরা এখানে তার উপর কিছুই দাঁড় করাচ্ছি না। আর বিজ্ঞান নাকি "প্রমাণ করেছে কক্কিক্স ধ্বংস হয় না" বলে যে কথা প্রচলিত, তার সমর্থনে পিয়ার-রিভিউ করা কোনো প্রকাশিত গবেষণা আমাদের জানা নেই — **আর যার প্রমাণ নেই তা বাদ দেওয়াই যুক্তির জন্য বেশি উপকারী, তা দিয়ে যুক্তিকে ভারী করার চেয়ে**। পুরো ভারটি প্রথম অংশেই: দেহের একটি জায়গা সম্পর্কে ছোট্ট একটি বাক্য, যাচাই করা সম্ভব, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের হাজার বছর আগে বলা... আর তা মিলে গেল। **তাহলে কে তাঁকে এর সন্ধান দিল?**

সূত্র Spemann & Mangold (1924) – the organizer · Nobel Prize in Physiology or Medicine 1935 · Moore & Persaud – *The Developing Human*

ভ্রূণবিজ্ঞান

৭ বিয়াল্লিশ রাত — তারপর আকৃতি ফুটে ওঠে

নুতফার উপর বিয়াল্লিশ রাত অতিবাহিত হলে আল্লাহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান, যিনি তাকে আকৃতি দেন এবং সৃষ্টি করেন তার শ্রবণ ও দৃষ্টি, তার চামড়া, গোশত ও হাড়।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

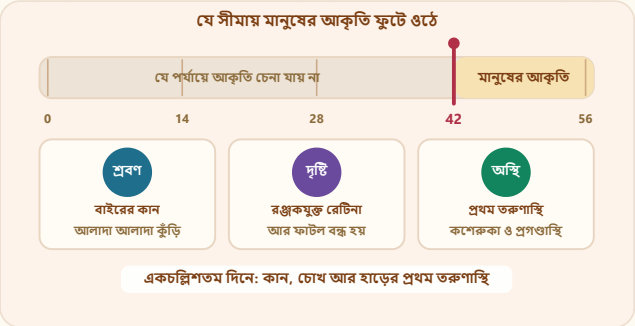

অদ্ভুত এক সংখ্যা, যা কেবল তখনই বলা হয় যখন সেটিই উদ্দেশ্য — চল্লিশ নয়, বিয়াল্লিশ

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, নুতফার উপর **বিয়াল্লিশ রাত** কেটে গেলে তাকে আকৃতি দেওয়া হয়, আর তাতে সৃষ্টি করা হয় শ্রবণ, দৃষ্টি, চামড়া, গোশত ও হাড়। আজকের ভ্রূণবিজ্ঞান ঠিক এই দিনটিতেই একটি **চৌকাঠ** বসায়: তার আগে আকৃতিতে এমন কিছুই নেই যা মানব-ভ্রূণকে অন্য কোনো ভ্রূণ থেকে আলাদা করে, আর সেখানে পৌঁছেই মানুষের চিহ্নগুলো ফুটতে শুরু করে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বিয়াল্লিশতম দিনের ভ্রূণ দেখার কোনো উপায় কারও ছিল না: তার দৈর্ঘ্য প্রায় **বারো মিলিমিটার**, আর সে মায়ের জরায়ুর ভেতরে। গ্রিকদের কাছে আকৃতি গঠনের একটি বিখ্যাত তারিখ ছিল: **অ্যারিস্টটল** *প্রাণীর ইতিহাস* গ্রন্থে স্থির করেছিলেন যে পুরুষ ভ্রূণ চেনা যায় **চল্লিশতম দিনে** আর নারী ভ্রূণ **নব্বইতম দিনে**, আর তার আগে তা বিভাজনহীন এক মাংসল বস্তু। এই তারিখ দুই দিক থেকেই ভুল: আকৃতি গঠনের সময়ে নর ও নারীর কোনো পার্থক্য নেই, আর জননাঙ্গ বারো সপ্তাহের আগে আলাদা করে চেনাই যায় না। তবু অ্যারিস্টটল চিকিৎসা ও আইনের উপর রাজত্ব করেছেন এক হাজার বছর। ভ্রূণের বিকাশের সঠিক সময়সূচি তৈরি হয়েছে বিশ শতকে এসে, যখন **কার্নেগি পর্যায়গুলো** দিনে-গোনা বয়স অনুসারে সাজানো হলো।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কার্নেগি পর্যায় সতেরো-র বয়স নিষেকের পর **একচল্লিশ দিন**, আর তাতে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য 11–14 মিলিমিটার। ঠিক সেই পর্যায়েই:

— **কান**: কর্ণছত্রের ছয়টি কুঁড়ি আলাদা হয়ে ওঠে এবং বাইরের কানের আকৃতি নেয়।

— **চোখ**: রেটিনার রঞ্জক স্পষ্ট দেখা দেয়, রেটিনার ফাটল বন্ধ হয়, আর লেন্সের তন্তু গড়ে ওঠে।

— **হাড়**: কশেরুকার পিণ্ডে এবং প্রগণ্ডাস্থি ও বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থিতে তরুণাস্থি জমতে শুরু করে। আর কণ্ঠা — গোটা শরীরে সবার আগে যে হাড়ে অস্থিভবন হয় — তার অস্থিভবন-কেন্দ্র দেখা দেয় সেই **ষষ্ঠ সপ্তাহেই**।

ব্রিটানিকা এই সময়টির বর্ণনায় বলে, চতুর্থ সপ্তাহে ভ্রূণকে একটি স্তন্যপায়ী বলে চেনা যায়, তারপর: "**দ্বিতীয় মাসের শেষ সপ্তাহগুলোতে বিকাশের পরিবর্তনগুলো প্রাইমেটদের আলাদা করে এমন লক্ষণ পেরিয়ে এমন এক অবস্থায় পৌঁছায়, যেখানে তাকে চেনা যায় মানুষ বলেই।**" আর দ্বিতীয় মাসের শেষ সপ্তাহগুলো শুরু হয় বিয়াল্লিশতম দিন থেকেই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে সূক্ষ্মতা রয়েছে **অদ্ভুত সংখ্যাটির** ভেতরে। বক্তা যদি সহজ কোনো সংখ্যা চাইতেন, বলতেন চল্লিশ — যে সংখ্যাটি সবকিছুতেই আরবদের মুখে চলে, **আর সেই সংখ্যাটিই তখনকার চিকিৎসাশাস্ত্রে তৈরি হয়ে বসেছিল**: চল্লিশ দিন, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে চিকিৎসা ও আইনে এক হাজার বছর ধরে। ধার করা হলে, কিংবা চালু কথার সঙ্গে তাল মেলানো হলে, চল্লিশই বেরোত। কিন্তু তিনি বললেন **বিয়াল্লিশ** — এমন সংখ্যা কেবল তখনই বলা হয় যখন সেটিই উদ্দেশ্য, আর যে কথা মুখস্থ করা হয় ও হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া হয় তাতে এমন সংখ্যা এলোমেলোভাবে বাছা হয় না। আর অ্যারিস্টটল নর-নারীতে ভাগ করে ভুল করলেন; হাদিস ভাগ করেনি, আর ঠিক বলেছে।

তারপর দেখুন, এই দিনটির সঙ্গে কী বাঁধা হলো: **আকৃতি দেওয়া**। প্রাণ নয়, নড়াচড়া নয়, স্পন্দন নয় — আকৃতি। আর ভ্রূণবিজ্ঞান ঠিক এই জিনিসটিকেই এই চৌকাঠে বসায়: তার আগে মানব-ভ্রূণের আকৃতি অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণ থেকে আলাদা করা যায় না, আর তার পরে চিহ্নগুলো ফুটে ওঠে।

তারপর দেখুন ক্রমটি: **তার শ্রবণ ও তার দৃষ্টি** — শ্রবণ আগে। কুরআন যেখানেই এই দুটির উল্লেখ করেছে, সর্বত্র এই ক্রমই ধরে রেখেছে।

আর সেই একই সপ্তাহে মিলে যায় হাদিসে নাম ধরে বলা তিনটি জিনিস: কান আকৃতি নেয়, রেটিনা রঞ্জক ধরে, আর প্রথম হাড় তার কেন্দ্র বাঁধে। **তিনটি আলাদা তন্ত্র একসঙ্গে নিজেদের চৌকাঠ পেরোচ্ছে।**

আর একটি সীমায় থামুন: ফেরেশতা যা করেন তা গায়েব, অণুবীক্ষণে তা মাপা যায় না, আর আমরা এখানে তার উপর কিছুই দাঁড় করাচ্ছি না। যা মাপা যায় তা হলো **সময়টি**: গুনে-রাখা একটি রাত, এমন এক দেহে যা কেউ দেখতে পেত না, অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরির এক হাজার বছর আগে বলা হয়েছিল... আর তা মিলে গেল। **তবে তাঁকে এ খবর কে দিল?**

সূত্র Aristotle – *History of Animals*, VII · O'Rahilly & Müller – Carnegie stage 17 · *Britannica* – "Prenatal development".

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা

৪ স্থির পানিতে কেউ যেন পেশাব না করে

তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে, যা প্রবাহিত হয় না, তারপর তাতেই গোসল করে।

বুখারি ও মুসলিম — মুত্তাফাকুন আলাইহি

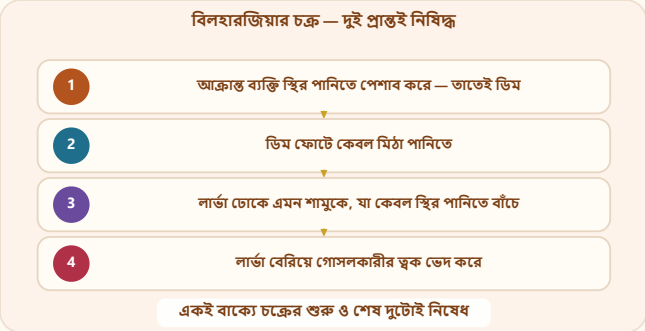

নিষেধ যদি কেবল নোংরার জন্য হতো, এই শর্তের কোনো মানে থাকত না: "স্থির পানি, যা প্রবাহিত হয় না"

সহজ কথায়

নবী ﷺ নিষেধ করেছেন **দুটি জিনিস একসঙ্গে**: স্থির, অপ্রবাহিত পানিতে পেশাব করা, আর তারপর সেই পানিতেই গোসল করা। আর এ দুটিই হুবহু **বিলহারজিয়া** রোগের চক্রের দুই প্রান্ত — মিসর ও আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে বিস্তৃত পরজীবী কৃমি: এর ডিম দেহ থেকে বেরোয় **পেশাবের সঙ্গে**, ডিম ফোটে কেবল **স্থির মিঠা পানিতে**, আর মানুষ পানিতে নামলে তা আবার তার দেহে ঢোকে **চামড়া ভেদ করে**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পেশাব যে রোগ ছড়াতে পারে, তা কেউ জানত না; পানিতে এমন কিছু আছে যা চামড়া ভেদ করে ঢোকে, তাও নয়। বরং স্থির জলাশয়ই ছিল একইসঙ্গে পান ও গোসলের উৎস। কৃমিটিকে সবার আগে নিজ চোখে দেখেন জার্মান চিকিৎসক **থিওডোর বিলহার্জ**, কায়রোর কসরুল আইনি হাসপাতালে, **1851** সালে। আর তা কীভাবে ছড়ায়, সেটি এরপরও অজানা থেকে যায় **চৌষট্টি বছর**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই চক্রটির যে বর্ণনা দেয়:

1 — আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের পেশাব দিয়ে মিঠা পানি দূষিত করে, তাতে থাকে পরজীবীর ডিম।

2 — ডিম ফোটে কেবল **মিঠা পানির** সংস্পর্শে এলে, আর বেরিয়ে আসে একটি সাঁতারু লার্ভা।

3 — লার্ভাটি ঢোকে একটি **মিঠা পানির শামুকে** — আর এই শামুক বাঁচে কেবল স্থির বা ধীরে বওয়া পানিতে — এবং তার ভেতরে হাজারে হাজারে বংশ বাড়ায়।

4 — সেখান থেকে বেরোয় অন্য লার্ভা, যারা পানিতে সাঁতরায়; কোনো মানুষ সে পানিতে নামলে তারা **কয়েক মিনিটেই তার চামড়া ভেদ করে**।

আর **লাইপার 1915** সালে প্রমাণ করেন সেই অংশটি, যা কেউ ভাবেইনি: সংক্রমণ **মুখ দিয়ে আদৌ ঘটে না**, ঘটে চামড়া ভেদ করেই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, নিষেধটি এসেছে **যৌগিকভাবে, একক নয়**। তিনি বলেননি যে পানিতে পেশাব করা নিষেধ। বলেননি যে স্থির পানিতে গোসল করা নিষেধ। বরং দুটি কাজকে এক বাক্যে জুড়ে দিয়েছেন "তারপর" দিয়ে: **তাতে পেশাব করা, তারপর তাতেই গোসল করা**। আর এ দুটিই — অক্ষরে অক্ষরে — সেই চক্রের প্রবেশপথ ও নির্গমনপথ।

এবার শর্তটি দেখুন: **"স্থির পানি, যা প্রবাহিত হয় না"**। নিষেধটি যদি নিছক ঘৃণা বা নোংরার কারণে হতো, এ শর্তের কোনো মানে থাকত না — প্রবহমান পানিতেও তো নোংরা নোংরাই। কিন্তু আজ আমরা যা জানি সেটিই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে শর্তটি একেবারে নিখুঁত: **বাহক শামুক বহমান পানিতে বাঁচে না**।

আর বিষয়টি যদি রুচি ও ঘেন্নার হতো, তবে নিষেধ করার মতো প্রথম জিনিস হতো তা থেকে **পান করা** — সেটিই মনের সবচেয়ে কাছে, সবার আগে সেটিই মাথায় আসে। অথচ নিষেধ পড়ল **গোসলের** উপর, যাকে পান করার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক কেউ ভাববেই না... যতক্ষণ না লাইপার 1915 সালে প্রমাণ করলেন যে সংক্রমণ ঘটে **চামড়া দিয়ে, মুখ দিয়ে নয়**।

এক বাক্যে তিনটি শর্ত — **স্থিরতা, পেশাব আর গোসল** — প্রতিটিই এমন এক রোগের চক্রের সত্যিকারের গিঁটে গিয়ে লাগে, যার প্রথম কৃমিটিই দেখা যায়নি বারো শতাব্দী পর্যন্ত, আর যার সংক্রমণের পথ জানা যায়নি তেরো শতাব্দী পর্যন্ত। **তবে এই তিনটির সন্ধান তাঁকে কে দিল?**

সূত্র WHO – fact sheet: *Schistosomiasis* · Leiper (1915) – the Bilharzia Mission in Egypt · Theodor Bilharz – Kasr el-Aini, Cairo, 1851

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা

৯ এটি ওষুধ নয় — এটি রোগ

এটি ওষুধ নয়, বরং এটি রোগ।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

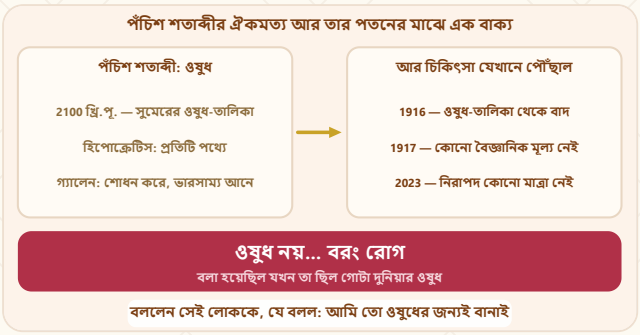

তিনি বলেননি এর ক্ষতি উপকারের চেয়ে বেশি — ওষুধ হওয়াকে অস্বীকার করলেন, রোগ হওয়াকে সাব্যস্ত করলেন

সহজ কথায়

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এলেন, তিনি নিষেধ করলেন। লোকটি বললেন: **"আমি তো কেবল ওষুধ হিসেবেই এটি বানাই।"** তিনি ﷺ বললেন: "এটি ওষুধ নয়, বরং এটি রোগ।" সেই যুগে মদ ছিল **গোটা দুনিয়ার ওষুধ**, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। আর আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে রেখেছে **প্রথম শ্রেণির ক্যানসার-সৃষ্টিকারী পদার্থের** তালিকায়, আর বলছে এর **কোনো নিরাপদ মাত্রাই নেই**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীন চিকিৎসায় মদ হালকাভাবে নেওয়া কোনো পানীয় ছিল না — এটি ছিল **চিকিৎসার একটি স্তম্ভ**। ইতিহাসের প্রাচীনতম ওষুধ-তালিকা, সুমের থেকে, প্রায় **2100 খ্রিস্টপূর্বাব্দে**, মদকে ওষুধ হিসেবেই নির্দেশ করে। মিসরীয় **এবার্স** প্যাপিরাস, প্রায় 1550 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, একে ভেষজের সঙ্গে মিশিয়ে জীবাণুনাশক ও ওষুধের বাহক বানায়। **হিপোক্রেটিস** প্রায় প্রতিটি রোগের পথ্যেই একে ঢোকান এবং ক্ষত পরিষ্কারের উপকরণ বানান। **গ্যালেন** বলেন, এটি দেহকে পরিশুদ্ধ করে ও ধাতুর ভারসাম্য রক্ষা করে। আর এ ধারা চিকিৎসার বইপত্রে চলেছে **প্রায় পঁচিশ শতাব্দী**, ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উল্টোটা শুরু হয় 1850 সালের পর, পরীক্ষামূলক চিকিৎসার হাত ধরে। **1916** সালে হুইস্কি ও ব্র্যান্ডি বাদ পড়ে **যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ-তালিকা** থেকে। **1917** সালে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করে, শক্তিবর্ধক বা উদ্দীপক হিসেবে অ্যালকোহলের **"কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই"**।

তারপর এল চূড়ান্ত রায়: ক্যানসার গবেষণার আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যালকোহলকে রাখে **প্রথম শ্রেণিতে** — ক্যানসার-সৃষ্টিকারী পদার্থের সর্বোচ্চ শ্রেণি, যেখানে আছে অ্যাসবেস্টস, তেজস্ক্রিয়তা ও তামাক। আর **জানুয়ারি 2023**-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশ করে যে **অ্যালকোহলের কোনো মাত্রাই স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয়**। অন্তত **সাত ধরনের ক্যানসার** এর সঙ্গে যুক্ত, আর প্রতি বছর প্রায় **7 লাখ 40 হাজার নতুন রোগী**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কথাটি কোথায় পড়ল, সেখানে থামুন। লোকটি স্বাদের জন্য পান করার কথা জিজ্ঞেস করেননি, খেয়ালের অজুহাতও দেননি — তিনি বলেছিলেন: **"আমি তো কেবল ওষুধ হিসেবেই এটি বানাই।"** অর্থাৎ সেদিন গোটা দুনিয়ায় যে যুক্তিটি সবচেয়ে শক্ত ছিল, তিনি সেটিই নিয়ে এসেছিলেন। নিষেধটি যদি নিছক ইবাদতের নিষেধ হতো, উত্তর হতো: "ওষুধ হিসেবেও এটি পান করা চলবে না।" কিন্তু উত্তর এল **এটি আসলে কী, সেই সংবাদ হয়ে**: এটি ওষুধই নয় — এটিই রোগ।

আর এ এমন এক বাক্য, যা সেদিন পৃথিবীর বুকে থাকা প্রতিটি চিকিৎসা-ধারার ঐকমত্যের বিরুদ্ধে যায়: গ্রিক, রোমান, পারসিক, ভারতীয় ও মিসরীয়। **একটি ধারাও এর সঙ্গে একমত নয়** — তাই এমন কেউ ছিল না যার কাছ থেকে কথাটি নেওয়া যেত, কারণ এ এমন কথা যার কোনো বক্তাই ছিল না।

তারপর সময় গড়াল। 1916 সালে মদ ওষুধ-তালিকা থেকে বেরিয়ে গেল, আর 2023 সালে হয়ে গেল প্রথম শ্রেণির ক্যানসার-সৃষ্টিকারী, যার নিরাপদ মাত্রা বলে কিছু নেই। অর্থাৎ পাঁচ শব্দের একটি বাক্য যা বলেছিল, সেখানে পৌঁছাতে চিকিৎসাশাস্ত্রের লেগেছে **তেরো শতাব্দী**।

আর গড়নটির নিখুঁত দিকটি লক্ষ করুন: তিনি বলেননি "এর ক্ষতি উপকারের চেয়ে বেশি" — সতর্ক মানুষ তো এ কথাই বলে, আর বলে নিরাপদ থাকে — বরং **ওষুধ হওয়াকে সরাসরি অস্বীকার করলেন, আর রোগ হওয়াকে সরাসরি সাব্যস্ত করলেন**। তেরো শতাব্দী পরে সংস্থাটিও ঠিক সেখানেই পৌঁছেছে: **কোনো নিরাপদ মাত্রা নেই। তবে তাঁকে কে খবর দিল?**

সূত্র IARC Monographs 100E – alcohol, Group 1 · WHO, 4 Jan 2023 – *No level of alcohol consumption is safe* · *U.S. Pharmacopeia* – alcohol removed, 1916

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা

১০ কোয়ারেন্টিন — চিকিৎসাবিজ্ঞানের হাজার বছর আগে

> কোনো ভূখণ্ডে প্লেগের কথা শুনলে সেখানে প্রবেশ কোরো না; আর তোমরা যে ভূখণ্ডে আছ সেখানে তা দেখা দিলে তা থেকে পালিয়ে বেরিয়ে এসো না।
>
> **বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি**

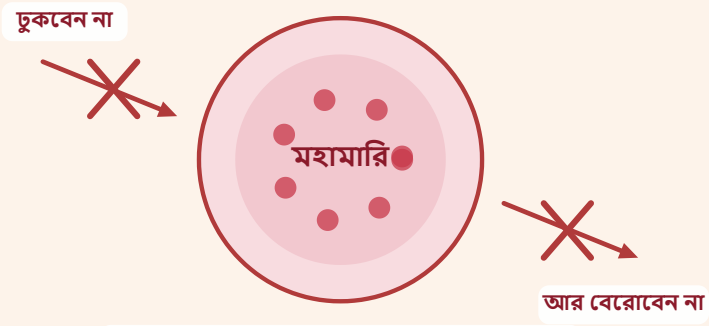

আধুনিক কোয়ারেন্টিনের সংজ্ঞা... দুই কথায়

সপ্তম খ্রিস্টাব্দে রচিত এক বিশ্বজনীন জনস্বাস্থ্য-নীতি

সহজ কথায়

কোনো দেশে মহামারি দেখা দিলে: আপনি বাইরে থাকলে **সেখানে ঢুকবেন না**, আর ভেতরে থাকলে **সেখান থেকে বেরোবেন না**। এটিই হুবহু **কোয়ারেন্টিনের** সংজ্ঞা, যা গোটা দুনিয়া করোনা মহামারিতে প্রয়োগ করেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মহামারিকে বোঝা হতো ক্রোধ, অপদেবতা কিংবা দূষিত বাতাস হিসেবে। আর তা দেখা দিলে স্বাভাবিক আচরণ ছিল **দলবেঁধে পালানো** — অথচ এটিই সবচেয়ে খারাপ কাজ, কারণ তাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। জীবাণুর কথা জানা ছিল না, আর রোগ যে মেলামেশায় ছড়ায় তাও জানা ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

জীবাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়নি ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে, পাস্তুর ও কখ-এর হাতে। ইউরোপে প্রথম সংগঠিত কোয়ারেন্টিন হয় রাগুসায় (দুব্রোভনিক) 1377 সালে, আর ভেনিস প্রথম স্থায়ী কোয়ারেন্টিন-কেন্দ্র গড়ে 1423 সালে — অর্থাৎ এই হাদিসের সাত শতাব্দী পরে। আর হাদিসে বর্ণিত নীতিটি হলো **দ্বিমুখী কোয়ারেন্টিন**: প্রবেশ নিষেধ এবং নির্গমন নিষেধ — বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধিতে হুবহু এ কথাই বলা আছে, আর 2020 সালে গোটা দুনিয়ায় এটিই প্রয়োগ করা হয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

হাদিসের দ্বিতীয় অর্ধাংশটিই কঠিনতর এবং বুদ্ধিদীপ্ততর। মহামারি-আক্রান্ত ভূখণ্ডে প্রবেশ নিষেধ করা — সতর্কতা থেকেই মন এ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। কিন্তু **সেখান থেকে বেরোনো নিষেধ করা** বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তিরই বিরুদ্ধে যায়, আর তা কেবল তখনই যুক্তিসংগত হয় যখন জানা থাকে, বেরিয়ে যাওয়া মানুষটি রোগ বয়ে নিয়ে যেতে পারে **অথচ সে টেরও পায় না** — অর্থাৎ **সংক্রমণের নীরব বাহক** ধারণাটি। এ ধারণা বিংশ শতাব্দীর আগে জানাই ছিল না। উমর ইবনুল খাত্তাব একে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন **আমওয়াসের প্লেগে**, সিরিয়া থেকে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে এনে; তাঁকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন: "আমরা আল্লাহর নির্ধারণ থেকে আল্লাহর নির্ধারণের দিকেই পালাচ্ছি।"

সূত্র Quarantine – Ragusa and Venice, 1377 · WHO – *International Health Regulations* (2005)

রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী

১১ রোমানরা পরাজিত হয়েছে — আর তারাই জয়ী হবে

আলিফ লাম মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে সবচেয়ে নিচু ভূখণ্ডে, আর তারা তাদের পরাজয়ের পর জয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যেই।

সূরা আর-রূম — আয়াত 1-4

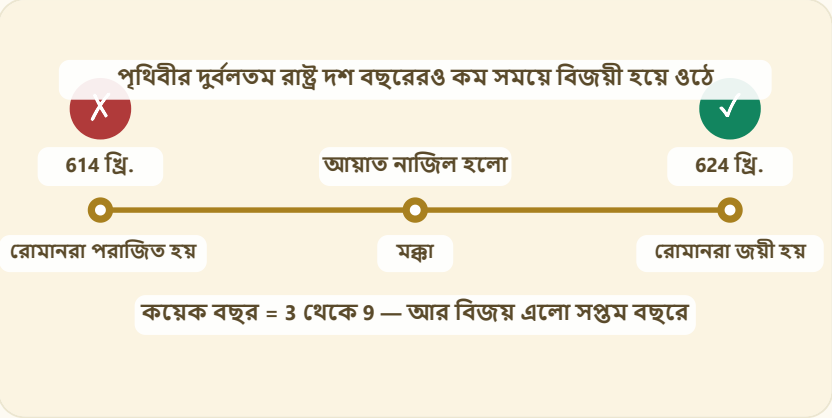

মক্কায় নাজিল হওয়া এক সংবাদ, হাজার হাজার মাইল দূরে চলা এক যুদ্ধ নিয়ে

সহজ কথায়

রোমানরা এমন চূর্ণ পরাজয়ে যুদ্ধ হারল যে মানুষ ধরে নিল তারা শেষ। তখন নাজিল হলো এক আয়াত: **রোমানরা কয়েক বছরের মধ্যেই জয়ী হবে**। আর তা ঘটল সাত বছর পরে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

614 খ্রিস্টাব্দে পারসিকরা রোমানদের নিদারুণভাবে চূর্ণ করে: তারা নেয় সিরিয়া ও জেরুজালেম, তারপর 618 থেকে 621 সালের মধ্যে মিসর, আর বন্দি করে নিয়ে যায় পবিত্র ক্রুশ। রোমান রাষ্ট্র তখন পূর্ণ ধসের কিনারায় — শূন্য কোষাগার, চূর্ণ সেনাবাহিনী, ভেতরে বিদ্রোহ। পৃথিবীর কেউই তার ফিরে আসার উপর বাজি ধরছিল না। আর মক্কার মুশরিকরা আবু বকরের সঙ্গে বাজি ধরেছিল যে আয়াতটি মিথ্যা — তখনো বাজি ধরা নিষিদ্ধ হয়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

622 সালে হিরাক্লিয়াস পাল্টা অভিযানে বেরিয়ে সে বছরেরই হেমন্তে শাহরবারাজকে হারান, তারপর **624 সালে গানজাকে** খসরুর বাহিনী ভেঙে দেন — সেটি বদরেরই বছর, যেমন পরের আয়াত বলেছে: "আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে।" আর **627 সালের ডিসেম্বরে** মসুলের কাছে নিনেভের যুদ্ধে পারসিক বাহিনীকে চূর্ণ করেন, এরপর 628 সালে খসরুকে ফেলে দেন ও ক্রুশ ফিরিয়ে আনেন। এসব লিপিবদ্ধ আছে বাইজেন্টাইন, পারসিক ও সিরিয়াক সূত্রে, ইসলামি সূত্র থেকে স্বাধীনভাবেই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি কোনো প্রজ্ঞাবাক্য নয়, বর্ণনাও নয় — এটি **বিষয় ও মেয়াদে নির্দিষ্ট এক ভবিষ্যদ্বাণী**, আর তা এসেছে যার পক্ষে বলা হচ্ছে তার জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তে। আরবিতে মেয়াদের জন্য ব্যবহৃত শব্দটি তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে বাঁধা — অর্থাৎ বন্ধ এক জানালা, যা মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল। দশ বছর বিজয় ছাড়া কেটে গেলে গোটা দাওয়াতই বিরোধীদের সামনে ধসে পড়ত। আর তার চেয়েও সূক্ষ্ম: "**সবচেয়ে নিচু ভূখণ্ডে**" — যুদ্ধটি হয়েছিল মৃত সাগরের অঞ্চলে, যা **এই গ্রহের সবচেয়ে নিচু শুকনো ভূমি** (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 430 মিটার নিচে) — এমন এক ভৌগোলিক সত্য, যা মাপা হয়নি ঊনবিংশ শতকের আগে।

সূত্র Kaegi – *Heraclius: Emperor of Byzantium* · Battle of Nineveh, 627 CE

ভূগোল

12 “সর্বনিম্ন ভূমিতে” — গ্রহের সবচেয়ে নিচু স্থলভাগ

আলিফ লাম মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে সর্বনিম্ন ভূমিতে, আর তারা তাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে।

সূরা আর-রূম — আয়াত 1-3

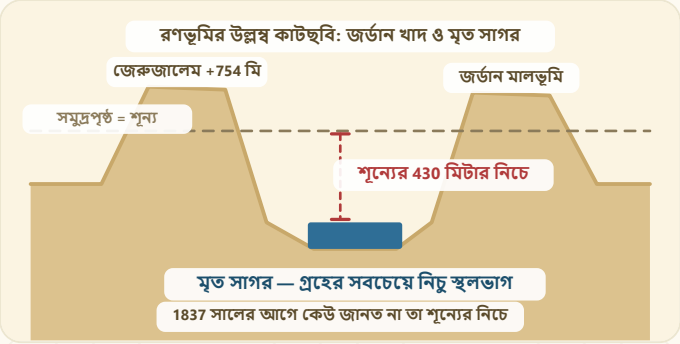

গ্রহের একমাত্র সেই জায়গা, যেখানে শব্দটি তার দুটি অর্থেই মিলে যায়

সহজ কথায়

আয়াতটি শুধু বলেনি “রোমকরা পরাজিত হয়েছে” — জায়গাটিও নির্দিষ্ট করেছে: **“সর্বনিম্ন ভূমিতে”**। আরবি শব্দ *আদনা* দুটি অর্থ বহন করে: **সবচেয়ে নিকটবর্তী**, আর **সবচেয়ে নিচু**। আর সেই যুদ্ধ ঘটেছিল এমন এক অঞ্চলে, যা সত্যিই **গোটা পৃথিবীপৃষ্ঠের সবচেয়ে নিচু উন্মুক্ত স্থলভাগ** — মৃত সাগরের চারপাশের জর্ডান চ্যুতি-উপত্যকা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সপ্তম শতাব্দীতে কারও কাছেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোনো জায়গার উচ্চতা জানার উপায় ছিল না। চোখ তা দেখায় না, আর উপত্যকায় নেমে আসা পথিক দেখে একটি নিচু উপত্যকা, ঠিক যেমন নিচু উপত্যকা সে ইয়েমেন, ওমান ও পারস্যে আগেই দেখে এসেছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা মাপা তখনও এক অজাত বিজ্ঞান: তার জন্য দরকার ব্যারোমিটার (যা 1643 সালের আগে উদ্ভাবিতই হয়নি) কিংবা উপকূল থেকে টেনে আনা ত্রিকোণমিতিক জরিপ। আর কারও মাথায়ই আসেনি যে শুকনো ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠের **নিচে** থাকতে পারে, আর তবু পানিতে ডুবে যায় না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1837 সালের মার্চে পর্যটক **মুর ও বিকি** পানির স্ফুটনাঙ্ক দিয়ে অঞ্চলটি মাপার চেষ্টা করেন, আর যে ফল বেরিয়ে আসে তা ভূগোলবিদদের চমকে দেয়: জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠের **নিচে**। এরপর লেফটেন্যান্ট **সাইমন্ডস** 1841 সালে ত্রিকোণমিতিক জরিপে মাপেন, আর আমেরিকান **লিঞ্চ** অভিযান মাপে 1848 সালে।

আজকের সংখ্যাটি: মৃত সাগরের পৃষ্ঠ প্রায় **সমুদ্রপৃষ্ঠের 430 মিটার নিচে**, আর এটিই **গোটা পৃথিবীপৃষ্ঠের সবচেয়ে নিচু উন্মুক্ত বিন্দু** — কোনো কিছুই এর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এটি মৃত সাগর চ্যুতির অংশ, যা মহা চ্যুতি-ব্যবস্থার উত্তর শাখা।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, আয়াতটির উপর জায়গার নাম বলার কোনো বাধ্যবাধকতাই ছিল না। আসন্ন বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী তা ছাড়াই পূর্ণ। তাই একটি ভৌগোলিক শর্ত জুড়ে দেওয়া মানে **মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানো**, বিশ্বাস করানোর সম্ভাবনা বাড়ানো নয় — আর যে মানুষ কোনো বাণী বানিয়ে তোলে, সে এর উল্টোটাই করে।

তারপর দেখুন, শব্দটির প্রথম অর্থ — “আরব থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী ভূমি” — নিজে থেকেই সঠিক ও যথেষ্ট; বাণীর কোনো কিছুই দ্বিতীয় অর্থের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থটিও **সত্য, আর এমনভাবে সত্য যাতে গ্রহের আর কোনো জায়গার ভাগ নেই**। দুটি অর্থের এক বিন্দুতে মিলে যাওয়া এমন কিছু নয় যার হিসাব কেউ কষে রাখে।

আর এখানে একটি সীমা বলে রাখা উচিত: প্রথম যুগের তাফসিরকারেরা একে নিকটবর্তিতা ধরেই পড়েছেন, নিচুতা নয়, কারণ নিচুতা তাঁদের জানাই ছিল না — আর এটিই তো সাক্ষ্য: **অর্থটি বাণীর ভেতরে ছিল মানুষের হাতে তা মাপার কোনো যন্ত্র আসার আগেই**। আর ভবিষ্যদ্বাণীটি নিজে — কয়েক বছরের মধ্যে বিজয় — নিজের পায়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আর এই বইয়ে তার নিজস্ব একটি পৃষ্ঠা আছে।

সূত্র The Dead Sea – the lowest land on earth · Moore & Beke (1837) – the first measurement of the depression · Lt. John Symonds – the 1841 trigonometric survey · NASA Earth Observatory – the Dead Sea

13

স্নায়ুবিজ্ঞান

মিথ্যাবাদী, পাপী এক ললাট

কখনোই নয়! সে যদি বিরত না হয়, আমি অবশ্যই তাকে ললাট ধরে টেনে নিয়ে যাব
মিথ্যাবাদী, পাপী এক ললাট।

সূরা আল-আলাক — আয়াত 15-16

এই খণ্ডের কাজ

- সিদ্ধান্ত নেওয়া
- মিথ্যা ও সত্য
- ভুল আচরণ রুখে দেওয়া
- পরিকল্পনা ও উদ্যোগ

মিথ্যা বলার নিয়ত মস্তিষ্কের আর কোথাও জন্মায় না

কার্যকরী প্রতিচ্ছবি দেখায়, মিথ্যা বলার মুহূর্তে সামনের মস্তিষ্কখণ্ড সক্রিয় হয়ে ওঠে

সহজ কথায়

"নাসিয়া" মানে মাথার একেবারে সামনের দিকটা। আর কুরআন তাকেই বলেছে "মিথ্যাবাদী, পাপী" — অর্থাৎ **মিথ্যা আর অপরাধ ঠিক এই জায়গা থেকেই বেরোয়**। স্নায়ুবিজ্ঞান এটিই প্রমাণ করেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মাথার কোনো নির্দিষ্ট অংশের সঙ্গে মিথ্যা বলার মতো নৈতিক কাজের যোগ তখন জানাই ছিল না। দার্শনিকেরা তো মূল কথাতেই একমত ছিলেন না: অ্যারিস্টটল চিন্তার কেন্দ্র রেখেছিলেন **হৃৎপিণ্ডে**, মস্তিষ্কে নয়। আর মস্তিষ্কের কোন অঞ্চলের কী কাজ, তা নির্ধারণের কাজ শুরুই হয়নি ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স — যা কপালের ঠিক পেছনেই থাকে — সিদ্ধান্ত নেওয়া, পরিকল্পনা করা আর আচরণ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র। কার্যকরী এমআরআই গবেষণা দেখায়, **ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ঠিক এই অঞ্চলটিকেই সক্রিয় করে**, কারণ তাতে সত্যকে চেপে রেখে তার বদলে আরেকটি কিছু বানিয়ে তুলতে হয়। আর এই অঞ্চল নষ্ট হলে মানুষ নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলে — যেমন 1848 সালের বিখ্যাত ফিনিয়াস গেজের ঘটনায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই সম্বন্ধের সূক্ষ্মতাটুকু লক্ষ করুন। আয়াত বলেনি "মিথ্যাবাদী পাপী ব্যক্তির ললাট" — অর্থাৎ ললাটের মালিকের কথা বলেনি। বরং **ললাটটিকেই** মিথ্যাবাদী ও পাপী বলেছে, ফলে কাজটিকে ব্যক্তির নয়, অঙ্গেরই কাজ বানিয়ে দিয়েছে। এ তো কাজের জায়গাটিকে শারীরবৃত্তীয়ভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া। আর আরও বেশি লক্ষণীয়: আয়াতে যাকে উদ্দেশ করা হচ্ছে, তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে তার সবচেয়ে সম্মানের জিনিসটিতে — অথচ নাম করে বলা হলো না তার হৃদয়, না তার জিহ্বা; বলা হলো তার মাথার সামনের দিক: মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত আর মিথ্যার কেন্দ্র।

সূত্র Harlow – the case of Phineas Gage · Kandel et al. – *Principles of Neural Science*

14

কীটতত্ত্ব

কর্মী মৌমাছি... সবই স্ত্রী

আর আপনার রব মৌমাছিকে ওহি দিলেন: পাহাড়ে ঘর বানাও ⬡ তারপর সব ফল থেকে খাও, আর তোমার রবের সহজ করে দেওয়া পথে চলো

সূরা আন-নাহল — আয়াত 68-69

মধুরস সংগ্রহ করতে আর মোম গড়তে আপনি যে মৌমাছি দেখেন, তার প্রতিটিই স্ত্রী

সহজ কথায়

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ মৌমাছিকে যত নির্দেশ দিয়েছেন, আরবিতে তার সবই এসেছে **স্ত্রীবাচক রূপে**: "বানাও", "খাও", "চলো" — তিনটি ক্রিয়াই স্ত্রীলিঙ্গে। আর বিজ্ঞান বলে: যারা ঘর বানায়, সংগ্রহ করে আর মধু তৈরি করে, সেই মৌমাছিরা **সবাই স্ত্রী**, একটি পুরুষও নেই।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীন দুনিয়ায় প্রচলিত ধারণা ছিল, মৌচাকের প্রধান একজন **পুরুষ রাজা** — অ্যারিস্টটল স্পষ্ট ভাষায় তা-ই লিখেছেন এবং তাকে নাম দিয়েছেন "রাজা"; ইউরোপীয়রাও শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁকে অনুসরণ করে একে King Bee বলে এসেছে। মৌচাকের প্রধান যে স্ত্রী, তা প্রমাণিত হয়নি 1668 সাল পর্যন্ত, ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ইয়ান সোয়ামারডামের হাতে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মৌচাকে তিনটি শ্রেণি: একজন **স্ত্রী রানি**, হাজার হাজার **স্ত্রী কর্মী** — এরাই মোম গড়ে, মধুরস সংগ্রহ করে, মধু বানায়, পাহারা দেয় আর পরিষ্কার রাখে — আর কয়েকশো **পুরুষ**, যাদের একমাত্র কাজ রানিকে নিষিক্ত করা, তারপর তারা মরে যায় কিংবা তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পুরুষ মৌমাছি খাবারের খোঁজে বেরোয় না, ঘর বানায় না, আর মধু তৈরিতে তার কোনো ভূমিকাই নেই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

পরপর তিনটি ক্রিয়ায় স্ত্রীবাচক রূপ পুরোপুরি ধরে রাখা — এমন এক ভাষায়, যেখানে দুই লিঙ্গ একসঙ্গে থাকলে পুরুষবাচক রূপই প্রাধান্য পায় — কোনো ব্যাকরণগত কাকতালীয়তা নয়। বরং নির্দিষ্টতা আরও সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে: এই তিনটি কাজই হুবহু **স্ত্রী কর্মী মৌমাছির** কাজ — ঘর বানানো, ফল-ফুলে চরে বেড়ানো, আর পথ ধরে যাওয়া-আসা। গোটা প্রজাতিকে বোঝানো উদ্দেশ্য হলে পুরুষবাচক বহুবচনই আসত। আর এ কথা সেদিনকার দুনিয়ার সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষেরা যা বিশ্বাস করতেন, তার ঠিক উল্টো।

সূত্র Aristotle – *Historia Animalium* · Jan Swammerdam – the ruler of the hive is female

15

ইন্দ্রিয়

শ্রবণ আগে, দৃষ্টি পরে — প্রতিবারই

আর তিনিই আপনাদের জন্য শ্রবণ, দৃষ্টি ও হৃদয় বানিয়েছেন, যাতে আপনারা কৃতজ্ঞ হন।

সূরা আন-নাহল — আয়াত 78

কান কাজ করছে

সপ্তাহ 24

চোখ কাজ করছে

সপ্তাহ 28

শ্রবণ দৃষ্টির চার সপ্তাহ আগে পূর্ণ হয়

গোটা কুরআনে মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গে দৃষ্টি একবারও শ্রবণের আগে আসেনি

সহজ কথায়

মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গে আর তার উপলব্ধির যন্ত্রগুলোর উল্লেখে কুরআনে দৃষ্টি শ্রবণের আগে আসেনি **একটিবারও**। আর বিজ্ঞান বলে: গর্ভস্থ শিশুর কান কাজ করে ও শোনে, তার চোখ কাজ শুরু করার কয়েক মাস আগেই।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

চোখই সেই ইন্দ্রিয়, যাকে প্রতিটি মানুষ সহজাতভাবেই আগে রাখে: "নিজের চোখে দেখেছি" কথাটি "শুনেছি"-র চেয়ে জোরালো, আর চাক্ষুষ সাক্ষ্য শোনা খবরের উপরে। সব ভাষাতেই স্বাভাবিক ক্রম শুরু হয় দৃষ্টি দিয়ে। আর গর্ভের শিশু যে আদৌ শোনে, তা-ই তো জানা ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কানের কক্লিয়ার গঠন সম্পূর্ণ হয় মোটামুটি বিংশ সপ্তাহে, আর শব্দে গর্ভস্থ শিশুর সাড়া প্রমাণিতভাবে ধরা পড়ে **চব্বিশতম সপ্তাহ** থেকে। অন্যদিকে রেটিনা ও দৃষ্টিপথ কাজের উপযোগী হয় না **আটাশতম সপ্তাহের** আগে। আর নবজাতক জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের কণ্ঠ চিনে নেয়, অথচ কয়েক মাস না গেলে স্পষ্ট দেখতেই পায় না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

মুজিজা কোনো একটি জায়গায় নয়, বরং **পূর্ণ ধারাবাহিকতায়**। ক্রমটি যদি কাকতালীয় হতো, তবে তেরোটি জায়গার অন্তত একটিতে তা বদলে যেত। অথচ তা অটুট, যদিও সাধারণ ভাষাবোধের বিপরীতে যায়। বরং সূক্ষ্মতা আরও বাড়ে: এসব জায়গায় "শ্রবণ" এসেছে **একবচনে** আর "দৃষ্টি" এসেছে **বহুবচনে** — কারণ শ্রবণ একটিমাত্র ইন্দ্রিয়, যা সব দিক থেকে একই ধরনের অনুভূতি গ্রহণ করে; অথচ দুটি চোখ দুটি আলাদা ছবি তৈরি করে, যা মস্তিষ্কে মিলিয়ে নেওয়া হয়।

সূত্র Moore & Persaud – *The Developing Human* · *Britannica* – "Prenatal development"

16

কলাবিজ্ঞান

ব্যথার বাস চামড়ায়

যতবার তাদের চামড়া পুড়ে পাকা হয়ে যাবে, ততবার আমি তাদের বদলে দেব অন্য চামড়া, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ নেয়।

সূরা আন-নিসা — আয়াত 56

ব্যথার সব গ্রাহক চামড়াতেই — পুড়ে গেলে অনুভূতি শেষ

তৃতীয় মাত্রার গভীর পোড়ায় ব্যথা হয় না — কারণ ব্যথার গ্রাহকগুলোই পুড়ে গেছে

সহজ কথায়

ব্যথার গ্রাহক সারা দেহে ছড়ানো, কিন্তু সবচেয়ে ঘন হয়ে থাকে **চামড়ায়**; দেহের আর কোনো অঙ্গে এত বেশি নেই। তাই চামড়া যখন গভীরভাবে পুড়ে যায়, সেই জায়গায় ব্যথার অনুভূতিই থেমে যায়। আর আয়াতটি চামড়া বদলে দেয়, যাতে অনুভূতি চলতে থাকে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ব্যথাকে ভাবা হতো গোটা দেহের একটি সাধারণ অনুভূতি, কিংবা হৃদয়ের বা আত্মার অনুভূতি। জানা ছিল না যে তার **বিশেষ স্নায়ু-গ্রাহক** আছে, কিংবা সেই গ্রাহকগুলোর একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। ব্যথার গ্রাহকের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা আসেনি 1906 সালের আগে, চার্লস শেরিংটনের হাতে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ব্যথার গ্রাহক (Nociceptors) হলো মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত, যা কেন্দ্রীভূত থাকে **চামড়ার স্তরগুলোতে**। তৃতীয় মাত্রার পোড়ায়, যেখানে চামড়া তার পুরো পুরুত্বজুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, **রোগী পোড়া জায়গায় ব্যথার অনুভূতি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেন** — এটি একটি স্বীকৃত রোগনির্ণায়ক লক্ষণ, যা দিয়ে চিকিৎসকেরা পোড়ার গভীরতা আলাদা করেন। আর অনুভূতি ফিরিয়ে আনতে চামড়া প্রতিস্থাপন করতে হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কারণটি আয়াতেই বলা আছে: **"যাতে তারা শাস্তির স্বাদ নেয়"**। অর্থাৎ চামড়া বদলে দেওয়া শাস্তির বাড়তি কোনো অংশ নয়, বরং **সেই শাস্তির অনুভূতি বজায় থাকার শর্ত**। আর এর জন্য দুটি বিষয় একসঙ্গে জানা থাকতে হয়: ব্যথার অনুভূতির জায়গা সবার আগে চামড়া, আর চামড়া একবার পুড়ে পাকা হয়ে গেলে **অনুভূতি বন্ধ হয়ে যায়**। আয়াতটি কেবল ব্যথার বর্ণনা দেয়নি, তার উপরে এমন একটি যুক্তি দাঁড় করিয়েছে, যা এই চিকিৎসাগত সত্যটি না থাকলে টেকেই না।

সূত্র Sherrington – *The Integrative Action of the Nervous System*, 1906 · Kandel et al. – *Principles of Neural Science*

শরীরবিদ্যা

১৭ গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে বিশুদ্ধ দুধ

আর নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে আপনাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আমি আপনাদেরকে পান করাই তাদের পেটের ভেতরে যা আছে তা থেকে — গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে — বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

সূরা আন-নাহল — আয়াত ৬৬

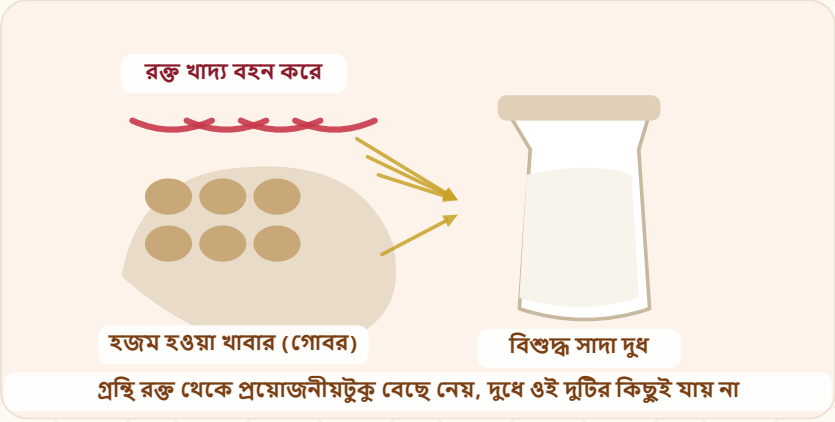

দুধ তৈরি হয় ওলানে, অন্ত্র থেকে রক্ত যেসব উপাদান বয়ে আনে তা দিয়ে

সহজ কথায়

আপনি যে সাদা নিখুঁত দুধ পান করেন, তা গাভির শরীরে তৈরি হয় অন্ত্রের পরিপাক হওয়া খাদ্য আর শিরায় বয়ে চলা রক্তের **মাঝখানের** এক জায়গায়। তবু তা বেরিয়ে আসে **বিশুদ্ধ** হয়ে — এর কোনোটির রংই তাতে লাগে না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

দুধ কীভাবে তৈরি হয়, তার কিছুই জানা ছিল না। ধারণা ছিল, মশকে যেমন পানি জমে, ওলানে দুধও তেমনি জমা হয়। আর তাকে পরিপাক হওয়া খাদ্য ও রক্তের সঙ্গে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে তার জায়গা **এই দুইয়ের মাঝখানে** নির্দিষ্ট করা — এ বিষয়ে কারও কোনো জ্ঞানই ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

খাদ্য অন্ত্রে পরিপাক হয়, তারপর তার উপাদানগুলো শোষিত হয়ে রক্তে মেশে। রক্ত সেগুলো বয়ে নিয়ে যায় ওলানের দুগ্ধগ্রন্থিতে; সেখানে আবরণী কোষগুলো রক্ত থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় শর্করা, অ্যামিনো অ্যাসিড, চর্বি ও লবণ তুলে নেয়, তারপর **একেবারে নতুন করে দুধ বানায়** আর তা নিঃসরণ করে। কাজেই দুধ না ছাঁকা রক্ত, না গলে যাওয়া খাদ্য; বরং এমন এক উৎপাদিত বস্তু, যার উৎপত্তির জায়গা পরিপাকতন্ত্র ও রক্তসংবহনের মাঝখানে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"মাঝখান থেকে" কথাটিই এখানে মুজিজার জায়গা। আয়াত বলেনি "গোবর ও রক্ত থেকে" — বললে দুধ হতো ওই দুটি থেকেই নিষ্কাশিত আর তাদের সঙ্গে মেশানো; বলেনি "গোবর ও রক্তের পরে"। বলেছে "এ দুইয়ের মাঝখান থেকে" — অর্থাৎ উৎপাদনের জায়গাটি **এই ধারাবাহিকতায় ওই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে**: পরিপাকের পরে ও রক্তের বহনের পরে, আর দুধ বেরোনোর আগে। তারপর উৎপন্ন বস্তুটিকে বলেছে **"বিশুদ্ধ"** — অর্থাৎ যা থেকে এসেছে তার কোনো চিহ্নই এতে নেই। এ এমন এক শারীরবৃত্তীয় পথের বর্ণনা, যা 1628 সালে রক্তসংবহন আবিষ্কারের আগে বোঝাই যায়নি।

সূত্র Harvey – *De Motu Cordis*, 1628 · Guyton & Hall – *Textbook of Medical Physiology*

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা

18 কারণ জানার আগেই হাত ধুয়ে নিন

তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগলে সে যেন পাত্রে হাত না ডোবায় যতক্ষণ না তিনবার তা ধুয়ে নেয়, কারণ সে জানে না তার হাত রাত কোথায় কাটিয়েছে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

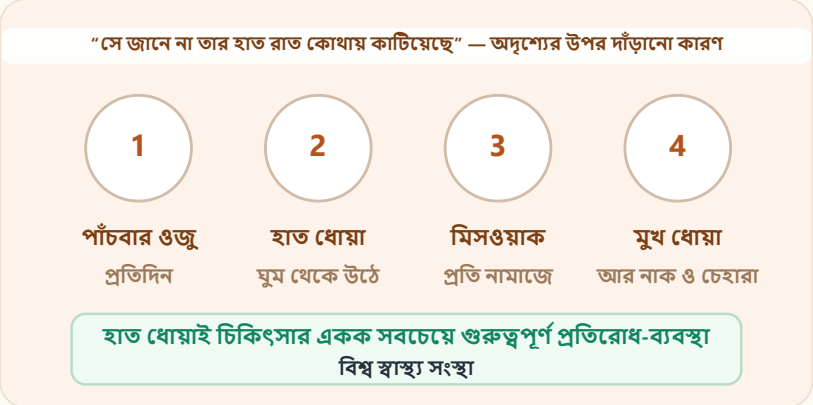

প্রতিটি মুসলিমের উপর দিনে পাঁচবার আরোপিত এক পবিত্রতার নিয়ম

সহজ কথায়

নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠে খাবার স্পর্শ করার আগে হাত ধোয়ার আদেশ দিয়েছেন, আর তার কারণ হিসেবে বলেছেন এক বিস্ময়কর কথা: **"সে জানে না তার হাত রাত কোথায় কাটিয়েছে"** — অর্থাৎ এমন এক সম্ভাব্য ক্ষতি আছে যা **চোখে দেখা যায় না**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জীবাণুর কথা কোনোভাবেই জানা ছিল না। পরিচ্ছন্নতা ছিল **চেহারা ও গন্ধের** ব্যাপার: হাত দেখতে পরিষ্কার হলেই তা পরিষ্কার। স্পর্শে ছড়িয়ে পড়া গোপন দূষণ বলে কোনো ধারণাই ছিল না। বরং ইউরোপের চিকিৎসকেরা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ থেকে উঠে হাত না ধুয়েই প্রসূতির সেবায় যেতেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাত ধোয়া আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতিতে **সমগ্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা**, আর এটি একাই বছরে লক্ষ লক্ষ সংক্রমণ ঠেকায়। এটি আবিষ্কৃত হয় 1847 সালে, হাঙ্গেরীয় চিকিৎসক **সেমেলভাইস**-এর হাতে; তিনি লক্ষ করেছিলেন, চিকিৎসকদের হাত ধোয়ানোয় প্রসূতিদের মৃত্যুহার 18% থেকে নেমে 2%-এ এসেছে — **আর তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল, তিনি চাকরি থেকে বিতাড়িত হন এবং মানসিক হাসপাতালে মারা যান**। আর মুসলিম দিনে পাঁচবার ধুয়ে নেয় তার দুই হাত, মুখ, মুখগহ্বর, নাক, দুই বাহু ও দুই পা।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দলিলের জায়গাটি **কারণ বর্ণনায়**, আদেশে নয়। পরিচ্ছন্নতার আদেশ সম্পর্কে বলা যেতে পারে, এটি রুচি কিংবা অভ্যাসের ব্যাপার। কিন্তু "**সে জানে না তার হাত রাত কোথায় কাটিয়েছে**" কথাটি কারণ দেখাচ্ছে এমন এক বিষয় দিয়ে যা **অজানা ও অদৃশ্য** — অর্থাৎ হাত দেখতে পরিষ্কার হলেও বিপদ থেকেই যায়। আর এটিই সেই গোপন দূষণের ধারণার মর্মকথা, যার উপর গোটা প্রতিরোধমূলক চিকিৎসাবিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে। এর সঙ্গে যোগ করুন বাকি ব্যবস্থাটুকু: প্রতি নামাজে মিসওয়াক, অজুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া, পাত্র ঢেকে রাখার আদেশ, পানীয়ের মধ্যে নিশ্বাস ফেলার নিষেধ, বদ্ধ পানিতে পেশাব করার নিষেধ, আর গোসল ফরজ হওয়া। জীবাণুতত্ত্বের বারো শতাব্দী আগে রচিত এক পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যব্যবস্থা।

সূত্র Ignaz Semmelweis – childbed fever, 1847-1861 · WHO – *Guidelines on Hand Hygiene in Health Care*, 2009

উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ

19 আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক — দশ বছরের চ্যালেঞ্জ

আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন ও যা সে উপার্জন করেছে, কিছুই কাজে আসেনি। অচিরেই সে জ্বলন্ত শিখার আগুনে প্রবেশ করবে।

সূরা আল-মাসাদ — আয়াত 1-3

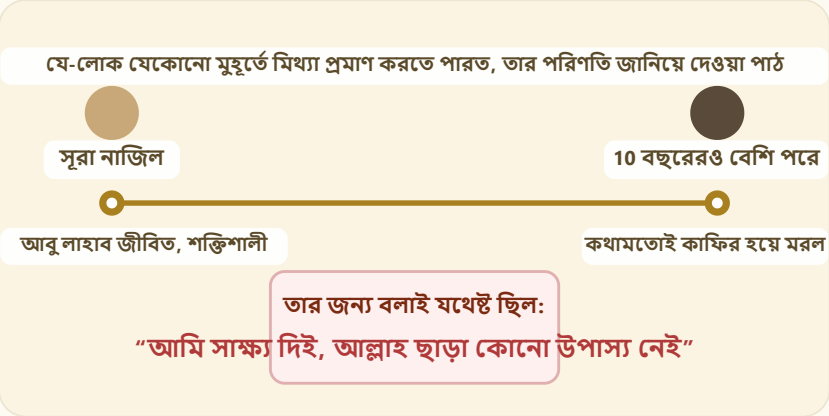

লেখা যেতে পারে এমন সবচেয়ে বিপজ্জনক বাক্য: যে এখনও মরেনি, তার বিষয়ে চূড়ান্ত রায়

সহজ কথায়

একটি সূরা নাযিল হলো, যাতে বলা হলো নবী ﷺ-এর চাচা — আবু লাহাব — **আগুনে প্রবেশ করবে**। অর্থাৎ সে কখনোই ইসলাম গ্রহণ করবে না। এরপর সে দশ বছরেরও বেশি বেঁচে ছিল, আর গোটা কুরআনকে ধসিয়ে দেওয়ার জন্য তার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট ছিল যে মিথ্যা করে হলেও সে কালিমা উচ্চারণ করে নিত — কিন্তু সে তা করেনি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আবু লাহাব ছিল এই দাওয়াতের সবচেয়ে কঠোর শত্রুদের একজন এবং তার ক্ষতি করার ক্ষমতায় সবার আগে; সে ছিল নবী ﷺ-এর চাচা এবং কুরাইশের একজন সরদার। আর আগামী দিনগুলোতে কোনো মানুষ কী হয়ে দাঁড়াবে, তা কারও পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না — কত কঠিন শত্রুই তো দীর্ঘ শত্রুতার পর ইসলাম গ্রহণ করেছে, যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও ইকরিমা ইবনে আবু জাহল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পর আবু লাহাব মারা যায় — অর্থাৎ সূরাটি নাযিল হওয়ার দশ বছরেরও বেশি সময় পর — **কুফরির উপরেই**, এমন এক রোগে যা থেকে তার নিজের পরিবারই দূরে সরে গিয়েছিল। সিরাত ও ইতিহাসের সব কিতাবেই এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে, আর ইসলামের বিরোধীদের কেউও এ নিয়ে বিতর্ক করেনি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি এমন কোনো দূরবর্তী বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নয় যাতে কারও হাত দেওয়ার ক্ষমতা নেই — বরং এটি **এক জীবিত মানুষের পছন্দ সম্পর্কে, যে নিজের কানে তা শুনেছে**। আর সে-ই ছিল এই দাওয়াত ভেঙে দিতে সবচেয়ে উৎসুক। তার সামনে দশ বছরেরও বেশি সময় ছিল একটিমাত্র বাক্য বলার — ভান করে মিথ্যা বলেও — আর তাতেই এই বাণী ধসে পড়ত এবং দাওয়াত সেদিনই শেষ হয়ে যেত। **এই চ্যালেঞ্জ দশ বছরেরও বেশি সময় খোলা রেখে দেওয়া, তারপর তা ঠিক যেমন বলা হয়েছিল তেমনভাবেই মিলে যাওয়া — এ ঝুঁকি কোনো মানুষ নেয় না।** এর সঙ্গে যোগ করুন, সূরাটি তার স্ত্রীর উপরেও একই রায় দিয়েছিল, আর সেও কুফরির উপরেই মারা যায়। দুইয়ের মধ্যে দুই, একসঙ্গে মিলে গেল — মিথ্যা প্রমাণ করার দশ বছরেরও বেশি সুযোগের পর।

20

মিশরবিদ্যা

ইউসুফের যুগে “বাদশাহ”, মূসার যুগে “ফিরআউন”

আর বাদশাহ বলল: তাকে আমার কাছে আনো, আমি তাকে নিজের জন্য বেছে নেব ...
আর ফিরআউন বলল: আমাকে ছাড়ো, আমি মূসাকে হত্যা করি।

সূরা ইউসুফ 54 — এবং সূরা গাফির 26

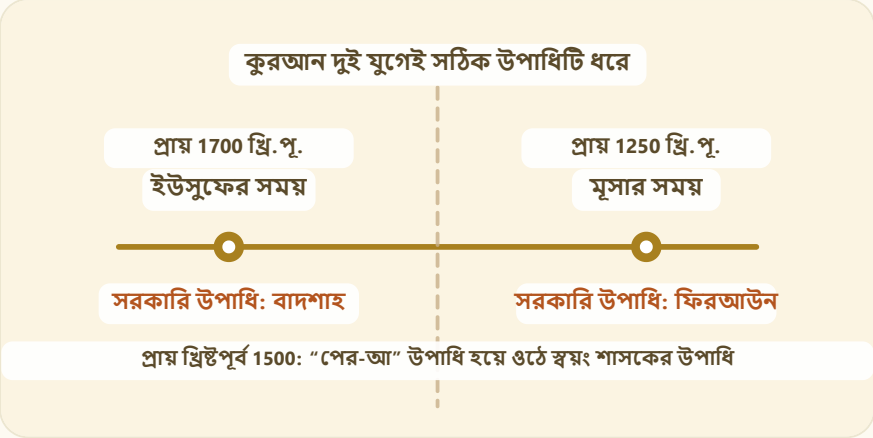

রাজকীয় উপাধির এই বদল এমন এক সত্য, যা হায়ারোগ্লিফ পাঠোদ্ধারের আগে জানা ছিল না

সহজ কথায়

কুরআন ইউসুফের যুগের মিশরের শাসককে বলে **“বাদশাহ”**, আর মূসার যুগের শাসককে বলে **“ফিরআউন”** — এবং কখনোই দুটিকে মিলিয়ে ফেলে না। মিশরবিদ্যা বলছে, এটিই হুবহু সঠিক।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরব উপদ্বীপে মিশরের শাসকদের উপাধি সম্পর্কে, কিংবা সেগুলো কখন বদলেছে সে সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না। গোটা অঞ্চলে চালু রীতি ছিল প্রতিটি মিশরীয় শাসককে নির্বিশেষে “ফিরআউন” বলা। এমনকি **তাওরাত নিজেই ইউসুফের শাসককে “ফিরআউন” বলে** আদিপুস্তকে বারবার।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

“ফিরআউন” শব্দটির মিশরীয় মূল **পের-আ (per-aa)**, যার অর্থ “মহান গৃহ” — অর্থাৎ প্রাসাদটি নিজেই, শাসকের ব্যক্তিসত্তা নয়। প্রাচীন ও মধ্য রাজ্যের গোটা সময়জুড়ে তা এমনই ছিল। **শাসকের নিজের** উপাধি হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়নি নতুন রাজ্যের আগে — মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব 15 শতকে তৃতীয় থুতমোসের শাসনকাল থেকে, আর এরপরই তা ছড়িয়ে পড়ে। ইউসুফের যুগ পড়ে তার আগে, আর মূসার যুগ তার পরে। আধুনিক মিশরবিদ্যার গ্রন্থে এটি স্থিরীকৃত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ধারাবাহিকতাই প্রমাণ। ব্যাপারটি কাকতালীয় হলে প্রায় ত্রিশটি স্থানে অন্তত একবার হলেও দুটি উপাধি মিলে যেত। কিন্তু কুরআন এই পার্থক্য পুরোপুরি বজায় রাখে। এর চেয়েও শক্তিশালী কথা হলো, এটি **সে যুগে আহলে কিতাবের মধ্যে প্রচলিত তাওরাতের পাঠের বিরুদ্ধে যায়** — অথচ সেটিই একমাত্র উৎস, যা থেকে নকল করার অভিযোগ তোলা হয়। বাহক যদি মানুষ হতো, সে ভুলটিও সঙ্গে করে বয়ে আনত। আর এই সংশোধন যে সঠিক, তা জানা গেছে এক হাজার বছরেরও বেশি পরে, হায়ারোগ্লিফ পাঠোদ্ধারের পর।

সূত্র Gardiner – *Egypt of the Pharaohs*, 1961 · *Britannica* – “Pharaoh”

ভ্রূণবিদ্যা

21 আলাকা: ঝুলন্ত এমন কিছু, যা রক্ত শুষে নেয়

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাকা থেকে।

সূরা আল-আলাক — আয়াত 2

তৃতীয় সপ্তাহের ভ্রূণ: তার আকার আর তার কাজ — দুটিই জোঁকের আকার ও কাজ

সহজ কথায়

আরবিতে "আলাক" শব্দটির তিনটি অর্থ: **ঝুলন্ত** কোনো বস্তু, রক্ত শুষে নেওয়া **জোঁক**, আর **জমাট রক্ত**। আর এই স্তরে ভ্রূণ তিনটি অর্থই একসঙ্গে ধারণ করে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

তৃতীয় সপ্তাহের ভ্রূণ কেউ দেখেনি। তার আকার দুই মিলিমিটারেরও কম, অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখাই যায় না। অ্যারিস্টটল ও গ্যালেন বলেছিলেন: ভ্রূণ গাছের শিকড়ের মতো নালি দিয়ে জরায়ুর সঙ্গে যুক্ত হয় আর মায়ের রক্তে পুষ্টি পায়। কিন্তু শুরুটা কীভাবে হয়, তা জানা ছিল না: **সে জরায়ুর আস্তরণে গেঁথে যায় আর তাতে ঝুলে থাকে**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ষষ্ঠ দিনে ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর আস্তরণে প্রোথিত হয় আর তাতে **ঝুলে থাকে**। তারপর তার কোষগুলো মায়ের রক্তনালি খুঁড়ে ফেলে, ফলে রক্ত এসে তার চারপাশের ফাঁকগুলো ভরে দেয় — অর্থাৎ সে **আক্ষরিক অর্থেই রক্ত শুষে নেয়**। আর তৃতীয় সপ্তাহের ভ্রূণের অণুবীক্ষণিক ছবি এমন এক আকার দেখায়, যা বাঁক আর পাশের খণ্ডবিন্যাস পর্যন্ত জোঁকের সঙ্গে মিলে যায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটিমাত্র শব্দে তিনটি অর্থের মিলে যাওয়াই হলো মুজিজা। কেবল ঝুলে থাকা বোঝানো উদ্দেশ্য হলে বলা হতো "মুআল্লাকা", আর কেবল রক্ত বোঝানো উদ্দেশ্য হলে বলা হতো "দম"। কিন্তু "আলাকা" একই সঙ্গে বর্ণনা করে: **জায়গা** (দেয়ালে ঝুলন্ত), **খাদ্যগ্রহণ** (রক্ত শুষে নেওয়া), **আকার** (জোঁকের মতো), আর **উপাদান** (জমাট রক্তে ঘেরা)। অণুবীক্ষণ আবিষ্কারের এক হাজার বছর আগে এক নিরক্ষর মানুষের উপরে নেমে আসা একটি শব্দে চারটি অণুবীক্ষণিক সত্য।

সূত্র Moore & Persaud — *The Developing Human* (implantation)

22

প্লেট টেকটনিক্স

পর্বত চলছে, আর আপনি ভাবছেন তারা স্থির

আর আপনি পর্বতগুলোকে দেখে স্থির মনে করেন, অথচ সেগুলো মেঘের চলার মতোই চলছে।

সূরা আন-নামল — আয়াত ৪৪

গোটা মহাদেশ অতি ধীরে চলছে, আর তার উপরে যা কিছু আছে সবই তার সঙ্গে চলছে

সহজ কথায়

পর্বতগুলোকে আপনার মনে হয় যেন দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছে না। অথচ সত্যি হলো, তারা **চলছে** — এত ধীরে যে আপনার চোখ ধরতে পারে না, ঠিক যেমন এক পলক তাকিয়ে আপনি মেঘকে সরতে দেখেন না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পৃথিবীর সব মানুষের কাছেই পর্বত ছিল চূড়ান্ত অটলতার প্রতীক। "পাহাড়ের মতো অটল" প্রতিটি ভাষারই প্রবাদ। কেউ দাবি করেনি যে তাদের নিচের জমিটাই সরে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

প্লেট টেকটনিক্স তত্ত্ব, যা বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে প্রতিষ্ঠিত: পৃথিবীর ভূত্বক বিশাল কতগুলো পাতে ভাগ করা, যেগুলো ভাসে ও পিছলে চলে, আর সঙ্গে নিয়ে চলে মহাদেশ ও পর্বতকে, বছরে কয়েক সেন্টিমিটার গতিতে। আজ এই গতি কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে মাপা হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উপমাটিই প্রমাণ: "আপনি সেগুলোকে স্থির মনে করেন" — অর্থাৎ তাদের স্থিরতা স্পষ্টভাবেই **চোখের ধাঁধা**। এরপর "মেঘের চলার মতো চলছে" — আর মেঘ চলে **আনুভূমিকভাবে, ধীরে, দলবদ্ধ হয়ে**; পড়েও না, লাফায়ও না। তাই আয়াতটি একটি সত্যিকারের গতির বর্ণনা দিয়েছে, সঙ্গে এ-ও বলে দিয়েছে কেন তা চোখে পড়ে না। আরও সূক্ষ্ম বিষয়: পর্বত একা চলে না, বরং চলে **তার চারপাশের সবকিছুকে সঙ্গে নিয়ে** — হুবহু মেঘের মতো।

সূত্র Wegener – *Die Entstehung der Kontinente und Ozeane*, 1915 · U.S. Geological Survey – understanding plate motions

23

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বিশ্বজগৎ প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে

আর আকাশ আমি নির্মাণ করেছি শক্তি দিয়ে, আর নিশ্চয়ই আমিই তা প্রসারিত করে চলেছি

সূরা আয-যারিয়াত — আয়াত 47

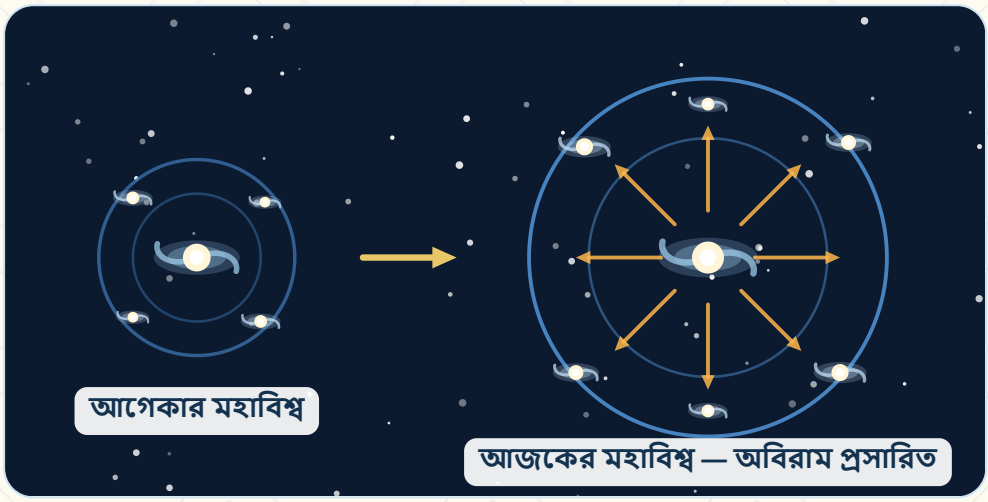

ফুলতে থাকা বেলুনের বিন্দুর মতো ছায়াপথগুলো দূরে সরে যাচ্ছে

সহজ কথায়

একটি বেলুনের কথা ভাবুন, যার গায়ে আপনি বিন্দু এঁকেছেন, তারপর সেটি ফোলালেন। প্রতিটি বিন্দু তার পাশের বিন্দু থেকে দূরে সরে গেল। বিশ্বজগৎ ঠিক এটিই করছে: আকাশ তার আয়ুর প্রতি সেকেন্ডে বড় হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষ — এমনকি বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাও — বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বজগৎ **স্থির ও অপরিবর্তনীয়**, তার আকার একটাই, বাড়েও না কমেও না। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিশ্বাসই প্রবল ছিল; এমনকি আইনস্টাইন নিজে তাঁর সমীকরণে একটি কৃত্রিম ধ্রুবক যোগ করেছিলেন, যাতে বিশ্বজগৎকে স্থির থাকতে বাধ্য করা যায়!

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1929 সালে এডউইন হাবল লক্ষ করেন, দূরের ছায়াপথগুলোর আলো **লালের দিকে হেলে পড়ছে** — অর্থাৎ সেগুলো আমাদের কাছ থেকে পালাচ্ছে। যত দূরের, তত দ্রুত পালাচ্ছে। বিশ্বজগৎ প্রসারিত হচ্ছে। আর 1998 সালে ধরা পড়ে, এই প্রসারণ **ত্বরান্বিত হচ্ছে**; এর আবিষ্কারকরা 2011 সালে নোবেল পুরস্কার পান।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি "মূসিউন" — কর্তৃবাচক বিশেষণ, যা বোঝায় এমন কাজ যা **চলমান ও অবিরাম**; অতীত কালের "আমি প্রশস্ত করেছি" নয়। অর্থাৎ প্রসারণ এখনো চলছে। আরব মরুভূমির এক নিরক্ষর মানুষ, যাঁর কাছে দূরবিনও নেই, বর্ণালিমাপক যন্ত্রও নেই, এমন একটি বাক্য বলছেন যা গোটা মানবজাতির ঐকমত্যের বিরুদ্ধে যায় — তারপর ইতিহাসের বৃহত্তম জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এসে অক্ষরে অক্ষরে তা সত্য প্রমাণ করে। এটি কাকতালীয় বলেও ব্যাখ্যা করা যায় না, বুদ্ধিমত্তা দিয়েও নয়।

সূত্র Hubble (1929), PNAS 15 · Riess et al. (1998) – accelerating expansion · Nobel Prize in Physics 2011

জ্যোতির্বিজ্ঞান

24 সূর্য এক প্রদীপ — আর চাঁদ এক আলো

কত বরকতময় তিনি, যিনি আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন, আর তাতে রেখেছেন একটি প্রদীপ ও একটি আলোকদাতা চাঁদ।

সূরা আল-ফুরকান — আয়াত 61

শব্দের এক সূক্ষ্ম পার্থক্য, যা মেলে শতাব্দীর পর শতাব্দী অজানা থাকা এক ভৌত পার্থক্যের সঙ্গে

সহজ কথায়

সূর্য নিজে থেকেই আলো দেয়, কারণ সে জ্বলছে। চাঁদের নিজের কোনো আলোই নেই — সে অন্ধকার পাথর, যা সূর্যের আলো আমাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। আর কুরআন সূর্যকে সব সময় বলে **প্রদীপ**, **প্রজ্বলিত প্রদীপ**, **দীপ্তি**, আর চাঁদকে সব সময় বলে **আলো** বা **আলোকদাতা** — গোটা কিতাবে একটিবারের জন্যও বর্ণনা দুটি উল্টে যায় না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আলোর উৎস আর তার প্রতিফলকের মধ্যেকার পার্থক্য জানা ছিল না। বরং জাতিগুলো সূর্য ও চাঁদ দুটোকেই আলোকময় দুই দেবতা গণ্য করে পূজা করত, আর পুরাণ সমান মর্যাদায় তাদের ডাকত "দুই জ্যোতি" আর "আকাশের দুই চোখ" নামে। খালি চোখ এদের আলাদা করে না: দুটোই আকাশে উজ্জ্বল চাকতি, বরং চাঁদের দিকে তাকাতে আরাম বেশি, তাই তাকেই বিশুদ্ধতর আলো বলে মনে হয়। খ্রিষ্টপূর্ব চার শতাব্দী আগে অ্যানাক্সাগোরাস বলেছিলেন, চাঁদ মাটির মতো একটি বস্তু যা সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে — কিন্তু তা ছিল গ্রিক আসরের একটি তাত্ত্বিক মত, আরব উপদ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছায়নি, আর দূরবিন আসার আগে পর্যবেক্ষণেও প্রমাণিত হয়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সূর্য একটি তাপ-নিউক্লীয় চুল্লি: নিজের কেন্দ্রে **দেড় কোটি ডিগ্রি** তাপমাত্রায় সে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে বদলে দেয়, আর তাতেই জন্ম নেয় আলো ও তাপ। চাঁদ ঠান্ডা পাথুরে বস্তু, নিজের থেকে দৃশ্যমান কোনো আলোই সে বিকিরণ করে না; তার যা কিছু আমরা দেখি সবই ফিরে আসা সূর্যের আলো। তার **প্রতিফলন-ক্ষমতা (অ্যালবিডো) প্রায় 0.12** — অর্থাৎ তার উপর যা পড়ে তার প্রায় 12% সে ফিরিয়ে দেয়, বাকিটুকু গিলে নেয়; তার পৃষ্ঠ আসলে পিচঢালা পথের মতোই কালো। এ কারণেই তার দশা বদলায়: আমরা তার আলোকিত অংশটুকুই দেখি, এর বেশি নয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আরবি ভাষা শব্দ দুটিকে আলাদা করে: **সিরাজ** অর্থাৎ প্রদীপ নিজের আগুন নিজের ভিতরেই বহন করে, আর **নূর** অর্থাৎ আলো না জ্বলেই আলোকিত করে। দূরবিন আসার শত শত বছর আগেই তাফসিরকারগণ এই পার্থক্য স্পষ্ট করে লিখে গেছেন।

আর প্রমাণ কোনো একটিমাত্র আয়াতে নয় — তা কাকতালীয় হতে পারত — বরং **গোটা কিতাবজুড়ে ধারাবাহিকতায়**: সূরা নাবায় সূর্যের জন্য "প্রজ্বলিত প্রদীপ", সূরা নূহে "তিনি চাঁদকে সেগুলোর মধ্যে আলো বানিয়েছেন আর সূর্যকে বানিয়েছেন প্রদীপ", সূরা ইউনুসে "সূর্যকে দীপ্তি আর চাঁদকে আলো", সূরা ফুরকানে "একটি প্রদীপ ও একটি আলোকদাতা চাঁদ"। চারটি জায়গা, আর বণ্টন একটিবারও নড়ে না।

কাকতালীয় হলে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো করে নাজিল হওয়া তেইশ বছরের ওহিতে অন্তত একবার হলেও বর্ণনা দুটি জায়গা বদল করত। **কাকতাল এত নিয়মনিষ্ঠ হয় না** — আর বক্তার হাতে কোনটি জ্বলে আর কোনটি প্রতিফলিত করে তা জানার একটিমাত্র উপায়ও ছিল না।

সূত্র NASA – *Sun: Facts* (nuclear fusion) · NASA NSSDC – *Moon Fact Sheet* (geometric albedo 0.12) · الطبري – «جامع البيان» (الفَرق بين الضياء والنور)

সৃষ্টিতত্ত্ব

২৫ তারা ছিল একটিই বস্তু... তারপর আলাদা হলো

কাফিররা কি দেখে না যে আসমানসমূহ ও যমিন মিশে লেগে ছিল, অতঃপর আমি তাদের পৃথক করে দিলাম?

সূরা আল-আম্বিয়া — আয়াত ৩০

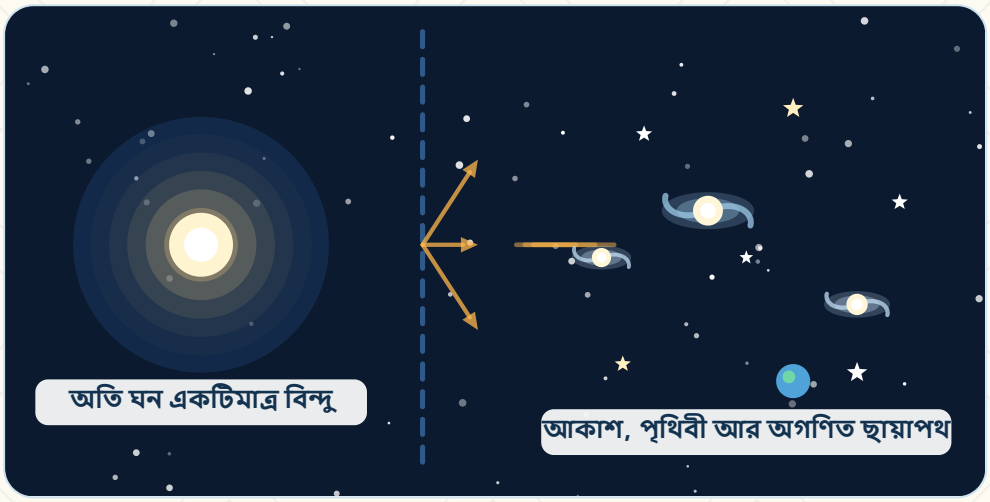

একটিমাত্র জোড়া লাগা পিণ্ড থেকে ছায়াপথে ভরা প্রসারমাণ বিশ্বজগৎ

সহজ কথায়

কুরআন বলছে: আসমান ও যমিন শুরুতে **পরস্পরে লেগে** একটিই বস্তু ছিল, তারপর আল্লাহ তাদের বিদীর্ণ করে আলাদা করে দিলেন। ঠিক যেমন একটিমাত্র বীজ ফেটে যায় আর তা থেকে বেরিয়ে আসে আস্ত গাছ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

"বিশ্বজগতের একটি সূচনা আছে" — এমন কোনো ধারণাই তখন ছিল না। বিশ্বাস ছিল, বিশ্বজগৎ **অনাদি, তার কোনো শুরু নেই**। আর যাঁরা কোনো উৎপত্তির কথা ভেবেছেন, তাঁরা ভেবেছেন যুদ্ধরত দেবতাদের উপকথা, একটিমাত্র বস্তুর বাস্তব বিচ্ছেদ নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব, যা আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত মডেল: গোটা বিশ্বজগৎ শুরু হয়েছিল **একটিমাত্র জোড়া লাগা, অতি-ঘন ও অতি-উত্তপ্ত অবস্থা** হিসেবে — মহাশূন্যের কোনো কোণে ফেটে পড়া কোনো গোলক নয় — তারপর স্থান নিজেই সর্বত্র একসঙ্গে প্রসারিত হয়ে তা বিদীর্ণ হলো। তিনটি প্রমাণে এটি নিশ্চিত হয়েছে: ছায়াপথগুলোর পরস্পর থেকে দূরে সরা; 1965 সালে আবিষ্কৃত "মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ", যা সেই বিস্ফোরণের অবশিষ্ট তাপ; এবং বিশ্বজগতে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের অনুপাত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আরবি "রাতক" শব্দের অর্থ এমন বস্তু, যা জোড়া লাগা ও বন্ধ; আর "ফাতক" অর্থ তাকে চিরে আলাদা করা। এটি এমন নিখুঁত বর্ণনা, যাতে অন্য ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা, আয়াতটি এটিকে পেশ করছে কাফিরদের প্রতি **চ্যালেঞ্জের দলিল** হিসেবে — "কাফিররা কি দেখে না" — অর্থাৎ এটি বাজি ধরছে যে একদিন তা দৃশ্যমান হবে। আর হয়েছেও, 1300 বছর পরে; এর দুই আবিষ্কারক 1978 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

সূত্র Penzias & Wilson (1965), Astrophysical Journal 142 · Nobel Prize in Physics 1978 · NASA / WMAP – Big Bang cosmology

26

ভূতত্ত্ব

পর্বত পৃথিবীতে গেঁথে দেওয়া খুঁটি

আমি কি পৃথিবীকে বিছানা বানাইনি, আর পর্বতগুলোকে খুঁটি?

সূরা আন-নাবা — আয়াত 6-7

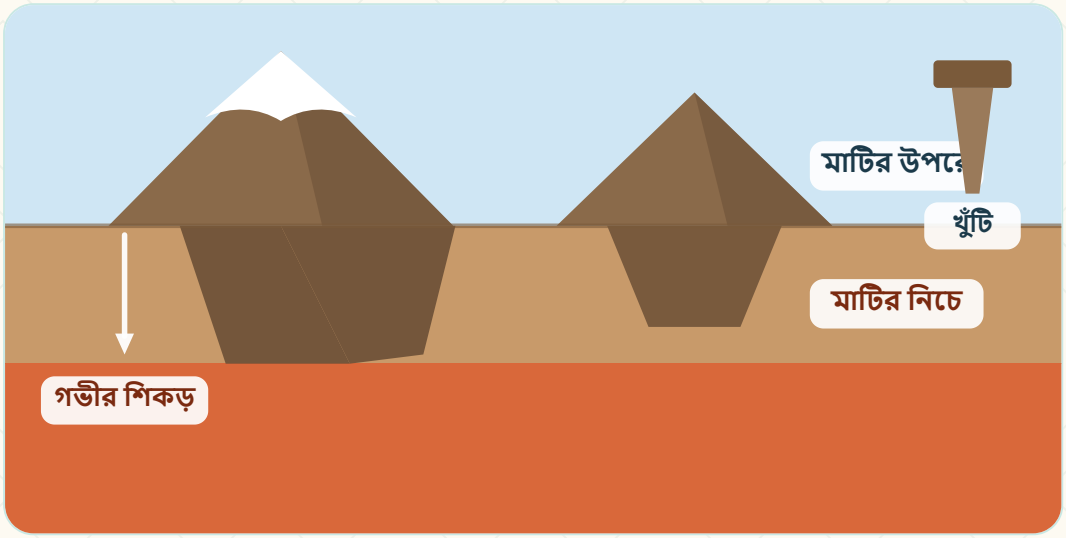

পর্বত তাঁবুর খুঁটির মতো: উপরে দেখা যায় সামান্য, আর মাটির নিচে গাঁথা অংশ তার বহুগুণ

সহজ কথায়

যে খুঁটি দিয়ে আপনি তাঁবু গাড়েন, তার সামান্য অংশ উপরে দেখা যায় আর বড় অংশটি মাটির ভিতরে গাঁথা থাকে। পর্বতও ঠিক তা-ই: তাদের **মাটির নিচে গভীর শিকড়** আছে, উপরে যা দেখছেন তার বহুগুণ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের চোখে পর্বত ছিল পাথরের একটি চাঁই, যা পৃথিবীর পৃষ্ঠের **উপরে** বসানো — টেবিলের উপর পাথরের মতো। তার নিচে যে আরও বিস্তার আছে, তা জানার কোনো উপায়ই কারও ছিল না, কারণ খোঁড়াখুঁড়ি অগভীর কুয়োর বেশি কখনো এগোয়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ভূতত্ত্ব একে বলে **পর্বতের শিকড়**: প্রতিটি পর্বত ভূত্বকের ভিতরে এমন গভীরতা পর্যন্ত ডুবে থাকে, যা সাধারণত তার দৃশ্যমান উচ্চতার প্রায় পাঁচ গুণ। এই শিকড়গুলোই **পর্বতকে ধরে রাখে ও তার ভার ভারসাম্যে রাখে**, ফলে ভূত্বক ম্যান্টলের উপর এমন এক উচ্চতায় ভাসে যা ঠিক করে দেয় তার নিজের পুরুত্ব ও ঘনত্ব — একেই বলা হয় সমস্থিতি (আইসোস্ট্যাসি)।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"খুঁটি" শব্দটি আকারের উপমাও নয়, ছুঁচালো আকৃতিরও নয়। আরবিতে খুঁটি এমন একটি জিনিস, যার পরিচয়ই তার কাজ দিয়ে: **এমন বস্তু যার বেশির ভাগটাই পোঁতা থাকে, যাতে তার উপরের জিনিসটাকে স্থির রাখে**। তাই আয়াতটি পর্বতকে দুটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যা তখন জানা ছিল না: পৃষ্ঠের নিচে বিস্তার, আর স্থির রাখা। আর এর আগে যা এসেছে তা লক্ষ করুন — পৃথিবীকে বলা হয়েছে "বিছানা", অর্থাৎ এমন কিছু যা নড়তে পারে — তাই খুঁটিগুলো আসে তাকে স্থির রাখতে।

সূত্র Airy (1855) – isostasy · U.S. Geological Survey – the earth's crust and mountain roots

সমুদ্রবিজ্ঞান

27 দুই সমুদ্র মেলে, অথচ মেশে না

> তিনি দুই সমুদ্র ছেড়ে দিয়েছেন, তারা মিলিত হয়; উভয়ের মাঝে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।
>
> **সূরা আর-রহমান — আয়াত 19-20**

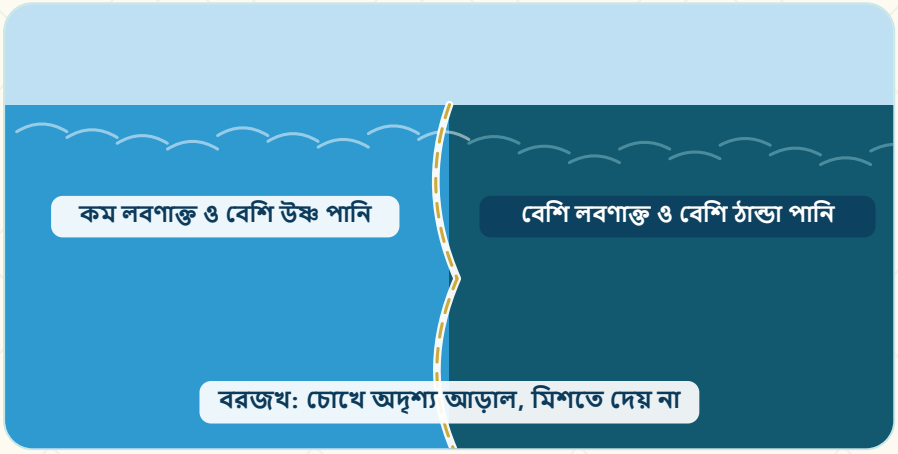

লবণাক্ততা ও তাপমাত্রায় আলাদা দুই পানি, আর তাদের মাঝে এমন এক আড়াল যা চোখ দেখে না, অথচ যন্ত্র পড়ে ফেলে

সহজ কথায়

দুটি ভিন্ন সমুদ্র যখন মেলে, তখন আপনি যেমন ভাবেন তেমন সঙ্গে সঙ্গে তারা মিশে যায় না। তাদের মাঝে **একটি আড়াল** থেকে যায়, যা একের পানিকে অন্যের পানি থেকে আলাদা রাখে, ফলে প্রতিটি সমুদ্র নিজের রং, নিজের লবণাক্ততা আর নিজের তাপ ধরে রাখে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রতিটি মানুষের কাছেই এটি স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে পানি পানির সঙ্গে মিললে তক্ষুনি মিশে যায় — যেমন দুই গ্লাস পানি মিশে যায়। পানি আর পানির মাঝে কোনো “দেয়াল” থাকতে পারে, এমন কল্পনাই কারও ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সমুদ্রবিজ্ঞান **সত্যিকারের পানি-আড়ালের** অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে, যেগুলোকে বলা হয় ফ্রন্ট ও হ্যালোক্লাইন: লবণাক্ততা, ঘনত্ব ও তাপমাত্রার পার্থক্য এমন এক সরু অন্তর্বর্তী অঞ্চল তৈরি করে যা **ঘনত্বে অত্যন্ত খাড়াভাবে ঢালু**, ফলে ভারী পানি হালকা পানির নিচ দিয়ে পিছলে যায়, আর দুটি মেশে কেবল তখনই যখন কোনো আলোড়ন ভারী পানিকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উপরে তোলে। জিব্রাল্টার প্রণালীতে এটি মেপে দেখা হয়েছে: ভূমধ্যসাগরের বেশি লবণাক্ত, ভারী পানি প্রায় একশো বিশ মিটার গভীরতায় আটলান্টিকের **নিচ** দিয়ে গলে বেরিয়ে যায়, তারপর আরও নামতে থাকে। এমন এক আড়াল, যা চোখ দেখে না, অথচ যন্ত্র পড়ে ফেলে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি কেবল না-মেশার কথা বলেই থামেনি; কারণটিরও নাম বলেছে: **বরযখ** — আরবিতে বরযখ হলো দুই জিনিসের মাঝখানে দাঁড়ানো আড়াল। এরপর তার ফলটিও বলেছে: একটি অন্যটির উপর সীমা ছাড়ায় না। এ এমন এক ঘটনার বর্ণনা, যা বিংশ শতাব্দীতে লবণাক্ততা ও ঘনত্ব মাপার যন্ত্র আসার আগে আবিষ্কারই হয়নি। আর অন্য এক আয়াতে বর্ণনা আরও তীক্ষ্ণ: “তিনি উভয়ের মাঝে রেখেছেন এক অন্তরাল ও **এক দুর্ভেদ্য আড়াল**”।

সূত্র Sverdrup, Johnson & Fleming – *The Oceans*, 1942 · NOAA – ocean fronts and haloclines

পানির প্রকার

২৮ মিঠা ও সুস্বাদু — আর লোনা ও তিতা

আর তিনিই দুই সমুদ্রকে পাশাপাশি চলতে দিয়েছেন — এটি মিঠা, তৃষ্ণা মেটায়, আর ওটি লোনা, তিতা — এবং উভয়ের মাঝে রেখেছেন এক আড়াল ও এক দুর্ভেদ্য অন্তরাল।

সূরা আল-ফুরকান — আয়াত 53

নদীর মোহনায় মিঠা পানি লোনা পানির উপরে ভাসে স্পষ্ট এক সীমারেখা নিয়ে

সহজ কথায়

মিঠা পানির নদী যখন লোনা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, দুই পানি সঙ্গে সঙ্গে মেশে না। তাদের মাঝে থেকে যায় এমন এক **আড়াল**, যা কৃত্রিম উপগ্রহ স্পষ্ট দেখতে পায়, আর যা বিস্তৃত হয় কয়েক দশ কিলোমিটার।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সবার কাছেই পানি তো পানিই, আর সহজ বোধ বলে পানি পানির সঙ্গে মিশে যায়। জানা ছিল না যে মিঠা পানি লোনা পানির চেয়ে **কম ঘন**, আর কেবল এই পার্থক্যই দুটিকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেয় — মিঠা পানি উপরে ভাসে এমন এক স্তরে, যা মেশে অত্যন্ত ধীরে। আর এ দুইয়ের মাঝে যা আছে তাকে "দুর্ভেদ্য" আড়াল বলা — সাধারণ পর্যবেক্ষণে এর কোনো সমতুল্য নেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বড় বড় নদীর মোহনায় — আমাজন, কঙ্গো ও মিসিসিপি — মিঠা পানি সমুদ্রের ভেতরে কয়েক দশ কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়ে যায় **নিজের রং ও ঘনত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে**, আর বিভাজনরেখাটি মহাশূন্য থেকে দেখা যায়। এর কারণ ঘনত্ব, লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার পার্থক্য, যা তৈরি করে এক সরু অন্তর্বর্তী স্তর — যাকে বলা হয় **হ্যালোক্লাইন** — এবং তা মিশ্রণকে ভীষণ ধীর করে দেয়। মহাকাশচারীরা বারবার এই দৃশ্যের ছবি তুলেছেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই আয়াত আর সূরা আর-রাহমানের আয়াতের মধ্যে যে পার্থক্য, তা এতই সূক্ষ্ম যে কেবল জানা লোকই তা ধরতে পারেন। সেখানে দুটি সমুদ্রই লোনা, কেবল বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন, আর মাঝের বিভাজককে বলা হয়েছে একটিমাত্র শব্দে: বারযাখ, আড়াল। আর এখানে — যেখানে মিলন **মিঠা ও লোনার** মধ্যে — যোগ করা হয়েছে দ্বিতীয় একটি বিশেষণ: "**এক দুর্ভেদ্য অন্তরাল**", অর্থাৎ জোরালো, কঠোর এক নিষেধ। ভৌত কারণটি স্পষ্ট: মিঠা ও লোনা পানির ঘনত্বের পার্থক্য দুটি লোনা পানির পার্থক্যের চেয়ে **অনেক বেশি**, তাই বিভাজন আরও স্পষ্ট, আরও শক্ত। ঘটনার তীব্রতার সঙ্গে শব্দের তীব্রতা ঠিক মিলে গেছে।

সূত্র NOAA – estuaries, where fresh water meets the sea · Sverdrup, Johnson & Fleming – *The Oceans*, 1942

29

উচ্চতার শারীরবিদ্যা

যত উপরে উঠবেন, বুক তত চেপে আসবে

আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সংকীর্ণ ও দম-বন্ধ করে দেন, যেন সে আকাশে উঠে চলেছে।

সূরা আল-আনআম — আয়াত 125

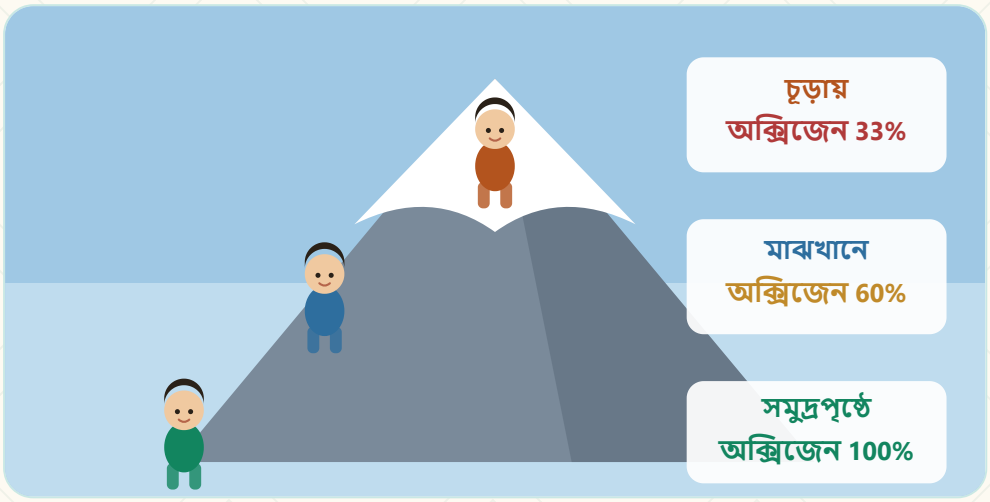

যত উপরে উঠবেন অক্সিজেন তত কমবে, শ্বাস সংকীর্ণ হবে আর কষ্ট বাড়বে

সহজ কথায়

খুব উঁচু কোনো পাহাড়ে উঠলে আপনি টের পাবেন, বুক চেপে আসছে আর শ্বাস নেওয়াটা পরিশ্রমের কাজ হয়ে গেছে। যত উপরে উঠবেন, বুক তত বেশি চেপে আসবে। কুরআন একে **উপমা** বানিয়েছে সেই মানুষের বুকের সংকীর্ণতার, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সেই পরিবেশে কোনো মানুষ বড়জোর সাধারণ এক পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠেছিল, আর উচ্চতার সঙ্গে শ্বাসকষ্টকে কেউ **ধাপে ধাপে** মেলায়নি। বরং বাতাসের যে ওজন বা চাপ বলে কিছু আছে, সেটিই জানা ছিল না; তোরিচেল্লি বায়ুচাপ মাপেন 1643 সালে গিয়ে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

যত উপরে উঠবেন, বায়ুচাপ তত কমবে আর রক্তে তত কম অক্সিজেন পৌঁছবে। 3,500 মিটারে তা সমুদ্রপৃষ্ঠের মানের প্রায় 60 শতাংশ, আর এভারেস্টের চূড়ায় প্রায় 33 শতাংশ। ফল হলো শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ আর মাথাব্যথা — যাকে বলা হয় **উচ্চতাজনিত অসুস্থতা**। এ কারণেই উড়োজাহাজে কেবিনের চাপ ধরে রাখার ব্যবস্থা বসানো হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটিমাত্র বাক্যাংশে তিনটি সূক্ষ্মতা। প্রথম: উপরে ওঠার সঙ্গে বুকের সংকীর্ণতাকে জুড়ে দেওয়া — এটিই নিজেই। দ্বিতীয়: "দম-বন্ধ" অর্থের শব্দটি সংকীর্ণতার উপর সংকীর্ণতা বোঝায় — অর্থাৎ তীব্রতায় একটি ক্রম। তৃতীয় এবং সবচেয়ে সূক্ষ্ম: "ওঠা" বোঝাতে যে আরবি ক্রিয়ারূপটি এসেছে তা তীব্রতাবাচক, যা নিছক উপরে ওঠা নয়, বরং **কষ্ট স্বীকার করে একটু একটু করে লড়াই করার** অর্থ দেয়। ব্যাকরণিক রূপটিই সেই ক্রম বহন করছে, আজ শরীরবিদ্যা যার বর্ণনা দেয়।

সূত্র Torricelli – the barometer, 1643 · John B. West – *High Life*, 1998

জলবায়ু ও বাতাস

30 গর্ভসঞ্চারী বাতাস — যা গাছ ও মেঘের বিয়ে দেয়

> আর আমি বাতাসকে পাঠিয়েছি গর্ভসঞ্চারীরূপে, তারপর আকাশ থেকে পানি নামিয়ে তা তোমাদের পান করিয়েছি।
>
> **সূরা আল-হিজর — আয়াত 22**

বাতাস গাছকে পরাগ দিয়ে গর্ভবতী করে, আর মেঘকে ধুলো ও তড়িৎ-আধান দিয়ে

সহজ কথায়

বাতাস শুধু জিনিস নাড়ে না — সে **বিয়ে দেয়**। সে এক ফুল থেকে আরেক ফুলে পরাগ বয়ে নেয়, যাতে ফল ধরে; আর ধুলো ও তড়িৎ-আধান বয়ে নেয় মেঘের কাছে, যাতে তারা বৃষ্টি ঝরায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বাতাস ছিল কেবল ঠেলা আর বয়ে নেওয়ার শক্তি, এর বেশি কিছু নয়: জাহাজ চালাত, ধুলো ওড়াত। তার যে **গর্ভসঞ্চারে** কোনো ভূমিকা আছে, তা জানা ছিল না; গাছেরও যে পুরুষ ও স্ত্রী আছে, সেটিই প্রমাণিত হয়নি 1694 সালের আগে — জার্মান বিজ্ঞানী কামেরারিউসের হাতে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বাতাসে পরাগায়ন হাজার হাজার উদ্ভিদ-প্রজাতির বংশবিস্তারের উপায় — গম, ধান, ভুট্টা, খেজুর আর পাইন। আর মেঘের ভেতরে: বাতাস বয়ে আনে ধুলো ও লবণের সেই **ঘনীভবন-কেন্দ্রক**, যেগুলোর চারপাশে জলীয় বাষ্প জমে ফোঁটা হয়; আর সে-ই মেঘের উপর ও নিচের মধ্যে তড়িৎ-আধান আলাদা করে দেয়, যা থেকে বিদ্যুৎ চমকায় আর বৃষ্টি নামে। ওই কেন্দ্রক ছাড়া মেঘ বৃষ্টিই ঝরায় না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আরবি শব্দটি এমন এক ক্রিয়া থেকে গড়া, ভাষায় যা **গর্ভসঞ্চার ও মিলনের** জন্যই নির্দিষ্ট — খেজুরগাছের হাতে-করা পরাগায়নের জন্য এই শব্দটিই চলত, যা আরবরা কেবল খেজুরের বেলাতেই জানত। সেই কাজটি **বাতাসের নিজের** দিকে আরোপ করা মানে এমন এক ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা, যা তখন জানাই ছিল না। আরও সূক্ষ্ম: আয়াতটি গর্ভসঞ্চার আর তারপর বৃষ্টি নামাকে সঙ্গে সঙ্গে পরপর রেখেছে — অর্থাৎ বাতাস মেঘকেও গর্ভবতী করে, যাতে সে বৃষ্টি দেয়। আর এ-ই শব্দে শব্দে আধুনিক আবহাওয়াবিজ্ঞান।

সূত্র Camerarius – *De sexu plantarum epistola*, 1694 · *Britannica* – "Pollination"

আবহাওয়াবিজ্ঞান

31 আকাশে পাহাড়, আর তাতে শিলা

আর তিনি আকাশ থেকে, তাতে যে পাহাড় আছে তা থেকে, শিলা নামান, তারপর যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন।

সূরা আন-নূর — আয়াত 43

কিউমুলোনিম্বাস: বিশাল এক পিণ্ড, যা এমনভাবে খাড়া উঠে যায় যেন আকাশে একটি পাহাড়

সহজ কথায়

শিলা — বরফের দানা — যে কোনো মেঘ থেকে নামে না। নামে কেবল সেইসব বিরাট মেঘ থেকে, যেগুলো **আকাশে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে ওঠে**, আর যাদের উচ্চতা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড়ের কয়েক গুণ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মাটি থেকে মেঘকে দেখায় আনুভূমিকভাবে ছড়ানো একটি চাদরের মতো, পাহাড়ের মতো নয়। মেঘের উচ্চতা জানার কোনো উপায় ছিল না, আর মেঘ যে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার হয়, সে বোধও ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

শিলা তৈরি হয় কেবল **কিউমুলোনিম্বাস** মেঘেই: ৪ থেকে 15 কিলোমিটার উঁচু খাড়া এক পিণ্ড — এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। তার ভেতরের ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ পানির ফোঁটাকে বারবার উপরে তুলে নেয়, সেখানে তা স্তরের পর স্তরে জমতে থাকে, শেষে এত ভারী হয় যে পড়ে যায়। এ কারণেই একটি শিলা চিরে ফেললে তার ভেতরে গাছের গুঁড়ির বলয়ের মতো বলয় দেখতে পাবেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"তাতে যে পাহাড় আছে তা থেকে শিলা" — এই কথাটি অল্প কয়েকটি শব্দে তিনটি তথ্য দেয়: মেঘের একটি **পাহাড়সদৃশ, খাড়া রূপ** আছে; শিলা থাকে তাদের **ভেতরে**, উপরে নয়; আর তা নামে **কেবল এগুলো থেকেই**, অন্য মেঘ থেকে নয়। এই নির্দিষ্টতাই আয়াতের সবচেয়ে সূক্ষ্ম অংশ, আর মাটিতে দাঁড়ানো কোনো মানুষের পক্ষে তা জানা অসম্ভব।

৩২ মিশ্রিত এক শুক্রবিন্দু

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; আর আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

সূরা আল-ইনসান — আয়াত 2

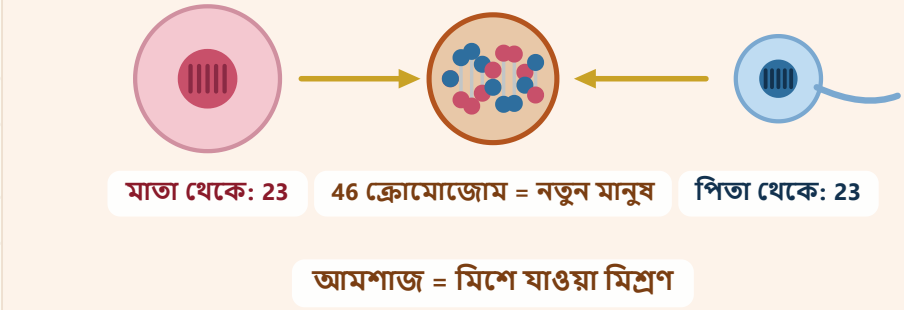

প্রথম কোষটি একটিমাত্র জিনিস নয়, বরং দুই পিতা-মাতা থেকে আসা দুটি অর্ধেকের মিশ্রণ

সহজ কথায়

মানুষের শুরু একটিমাত্র তরল থেকে নয় — বরং দুটি উপাদানের **মিশ্রণ** থেকে: অর্ধেক বাবার আর অর্ধেক মায়ের, যে দুটি মিশে গিয়ে একটি নতুন জিনিস হয়ে যায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, সন্তান তৈরি হয় কেবল পুরুষের তরল থেকে, আর মা কেবল **একটি পাত্র আর এক টুকরো জমি, যেখানে বীজ গজায়**। এ কথা অ্যারিস্টটলের লেখায় স্পষ্ট ভাষায় আছে, আর শতাব্দীর পর শতাব্দী চিকিৎসাশাস্ত্রে তা-ই চলেছে। নারীর ডিম্বাণু আবিষ্কৃতই হয়নি 1827 সালের আগে, কার্ল আর্নস্ট ফন বেয়ারের হাতে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নিষেক: 23টি ক্রোমোজোম বহনকারী একটি শুক্রাণু 23টি ক্রোমোজোম বহনকারী একটি ডিম্বাণুর সঙ্গে মিশে যায়, আর তৈরি হয় 46 ক্রোমোজোমের একটিমাত্র কোষ, যা গোটা মানুষটির উৎস। কাজেই প্রথম শুক্রবিন্দুটি দুটি সমান উপাদানের **প্রকৃত মিশ্রণ**, একক কোনো বস্তু নয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"**আমশাজ**" শব্দটি "মাশাজ"-এর বহুবচন; অভিধানে এর অর্থ — এমনভাবে মিশে যাওয়া মিশ্রণ, যে একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না। আর এটি একটি একবচন শব্দের ("নুতফা", একবচন) বিশেষণ — অর্থাৎ ওই একটি শুক্রবিন্দু নিজেই মিশ্রণসমূহ। এ কথা দুই হাজার বছর দুনিয়া শাসন করা অ্যারিস্টটলের মতকে শুধরে দেয়। আর অন্য এক আয়াতে বিবরণ আরও বাড়ে: মানুষ সৃষ্টি হয়েছে "সবেগে নির্গত পানি" থেকে, তারপর "শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা স্খলিত হয়" — আর কুরআন পুরুষ ও নারী হওয়ার পার্থক্য দেয় শুক্রবিন্দুর উপরে, জরায়ুর উপরে নয়।

সূত্র von Baer – *De ovi mammalium et hominis genesi*, 1827 · Moore & Persaud – *The Developing Human*

শারীরস্থান

৩৩ মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মাঝখান থেকে

সুতরাং মানুষ দেখুক, তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে, যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়গুলোর মাঝখান থেকে।

সূরা তারিক — আয়াত 5-7

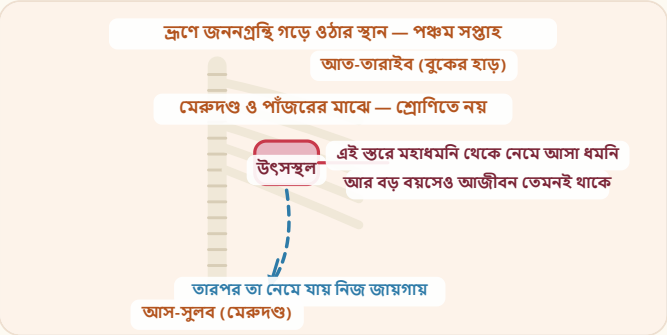

গ্রন্থিটি এখানেই জন্ম নেয়, তারপর নেমে যায়... আর তার ধমনি কখনোই সঙ্গে সরে না

সহজ কথায়

আয়াত বলছে, সৃষ্টির পানি বের হয় **মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মাঝখান থেকে** — অর্থাৎ **শিরদাঁড়া** আর **বুকের হাড়গুলোর** মাঝখান থেকে। আর ভ্রূণবিজ্ঞান বলছে, **প্রজনন-গ্রন্থি ঠিক এই জায়গাতেই তৈরি হয়**, তারপর নেমে যায় তার পরিচিত জায়গায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীন শারীরস্থান অঙ্গটিকে সেখানেই দেখত, যেখানে তাকে পাওয়া যেত। হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও তাঁদের পরবর্তীরা সৃষ্টির পানির উৎস খুঁজেছেন কখনো মস্তিষ্কে, কখনো শরীরের প্রতিটি অঙ্গে। কিন্তু তার উৎস **পিঠ ও বুকের মাঝখানে পেটের উপরের দিকের এক জায়গায় আটকানো** — এমন এক জায়গা, যার সঙ্গে বাইরে থেকে কোনো কিছুরই সম্পর্ক দেখা যায় না — এ কথা পর্যবেক্ষণ থেকে কোনোদিনই বেরিয়ে আসতে পারে না, কেননা অঙ্গটির জন্ম কেবল কয়েক মিলিমিটার লম্বা ভ্রূণেই দেখা যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পঞ্চম সপ্তাহে প্রজনন-গ্রন্থিটি দেখা দেয় যাকে বলা হয় **মূত্র-জননাঙ্গীয় উঁচু ভাঁজ** (urogenital ridge) তার উপর; এটি পেটের পশ্চাৎ প্রাচীরের সঙ্গে লেগে থাকা সরু একটি পট্টি, অবস্থান বক্ষদেশের নিচের ও কটিদেশের উপরের কশেরুকার সমান উচ্চতায় — অর্থাৎ **ঠিক শিরদাঁড়া ও বক্ষপঞ্জরের মাঝখানে**। তারপর তা দীর্ঘ এক যাত্রায় নেমে যায় তার চূড়ান্ত জায়গায়।

আর **রেখে যাওয়া চিহ্নই চিরকালের জন্য উৎসের প্রমাণ**: তাকে পুষ্টি জোগানো ধমনিটি বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী পাশের শ্রোণি-রক্তনালি থেকে বের হয় না, বরং নামে **দ্বিতীয় কটি-কশেরুকার কাছে উদর-মহাধমনি থেকে** — যেখানে সে আগে ছিল। তার লসিকানালি ও স্নায়ুগুলোরও একই দশা। এ কারণেই তার টিউমার ছড়ায় পেটের উপরের দিকের গ্রন্থিতে, শ্রোণির গ্রন্থিতে নয় — আর এটি এমন এক ব্যবহারিক নিয়ম, যা প্রত্যেক ক্যান্সার-চিকিৎসক জানেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

থমকে দাঁড়ানোর মতো ব্যাপারটি হলো, **বর্ণনাটি চোখে যা দেখা যায় তার সঙ্গে মেলে না**। যিনি দেখে দেখে বর্ণনা করেন, তিনি সেই জায়গার কথাই বলেন যেখানে অঙ্গটিকে পান; জন্মের কয়েক মাস আগেই অঙ্গটি যে জায়গা ছেড়ে এসেছে, সেই জায়গার কথা নয়। আয়াতটি ইঙ্গিত করছে **উৎসের** দিকে, **অবস্থানের** দিকে নয় — আর এখানেই বিস্ময়।

আর এখানে একটি সীমা স্পষ্ট করে বলা দরকার: প্রাচীন মুফাসসিরগণ আয়াতটি বুঝেছেন "পুরুষের মেরুদণ্ড ও নারীর বুক" অর্থে, আর তা একটি সংগত ভাষাগত ব্যাখ্যা, যা ফেলে দেওয়ার নয়। আমরা দাবি করছি না যে শারীরস্থানগত ব্যাখ্যাই একমাত্র নির্ধারিত অর্থ, কিংবা কেবল তার উপরেই কিছু দাঁড় করাচ্ছি না। আমাদের কথা কেবল এটুকুই: **দুটি শব্দ অক্ষরে অক্ষরে সেই জায়গাটিই বর্ণনা করছে, তেরো শতাব্দী পরে ভ্রূণবিজ্ঞান যাকে ঐ পানির উৎস বলে প্রমাণ করেছে** — আর সেই জায়গাটি আজও প্রত্যেক জীবিত মানুষের শারীরস্থানে নিজের কথা ঘোষণা করে যাচ্ছে, এমন এক ধমনির পথে, যার ব্যাখ্যা এ ছাড়া দাঁড়ায় না যে অঙ্গটির শুরু ওখানেই হয়েছিল।

সূত্র Moore & Persaud – *The Developing Human* (the genital ridge) · The genital ridge – where the gonad first forms · The gonadal artery – still arising from the aorta at L2

34

বংশগতিবিদ্যা

নর ও নারী — নির্ধারণ করেন পিতা

আর তিনিই জোড়া সৃষ্টি করেছেন — নর ও নারী — এক ফোঁটা শুক্র থেকে, যখন তা স্খলিত হয়।

সূরা আন-নাজম — আয়াত 45-46

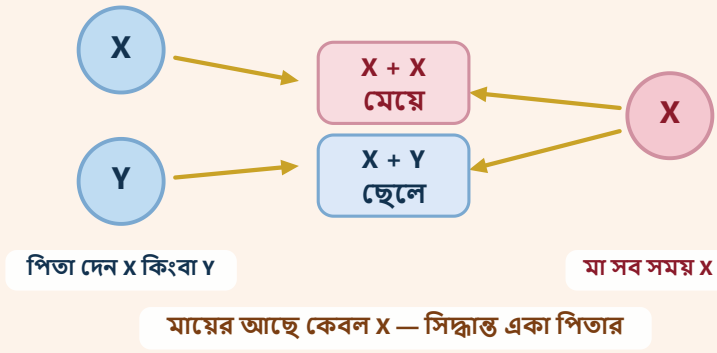

সন্তান ছেলে না মেয়ে, তা স্থির হয়ে যায় নিষেকের মুহূর্তেই — শুক্রাণু যা বহন করে তা দিয়ে

সহজ কথায়

সন্তান ছেলে না মেয়ে? এ সিদ্ধান্ত কখনোই মায়ের দিক থেকে আসে না — আসে **পিতার** দিক থেকে। কারণ মা বহন করেন কেবল এক ধরনের, আর পিতা বহন করেন দুই ধরনেরই।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য নারীকে দোষ দেওয়া হতো — কোনো কোনো সমাজে আজও হয় — আর স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হতো এই বলে যে সে "ছেলে জন্ম দিতে পারে না"। এম্পিডোক্লিসের মত ছড়িয়ে পড়েছিল যে জরায়ুর উত্তাপই লিঙ্গ নির্ধারণ করে, আর শত শত বছর চিকিৎসাশাস্ত্রে চলেছে এই কথা যে পুত্র আসে জরায়ুর ডান দিক থেকে আর কন্যা বাম দিক থেকে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

লিঙ্গ-ক্রোমোজোম: নারী XX, পুরুষ XY। ডিম্বাণু সর্বদা X বহন করে, ব্যতিক্রমহীনভাবে; কিন্তু শুক্রাণু X বহন করতে পারে, আবার Y-ও। X-বাহী শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলন হলে সন্তান কন্যা, আর Y-বাহী হলে পুত্র। **অর্থাৎ লিঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয় পিতার দিক থেকে।** এটি আবিষ্কার করেন নেটি স্টিভেনস, 1905 সালে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি জোড়ার সৃষ্টিকে — নর ও নারীকে — সম্বন্ধ করেছে **শুক্রবিন্দুর সঙ্গে, যখন তা স্খলিত হয়**; আর এই ক্রিয়াপদটি বিশেষভাবে পুরুষের পানির জন্যই ব্যবহৃত হয়। উৎস নির্দিষ্ট, কোনো দ্ব্যর্থতা নেই। এই বাণী যদি মানুষের রচনা হতো, এমন এক সমাজে যেখানে সন্তানের লিঙ্গের জন্য নারীকে দোষ দেওয়া হতো, তবে নিরাপদ পথ ছিল চুপ থাকা কিংবা প্রচলিত মত মেনে নেওয়া। অথচ তা **প্রচলিত বিশ্বাসের সরাসরি বিরোধিতা করে বিষয়টি স্পষ্টভাবে পিতার দিকেই সম্বন্ধ করেছে** — আর তেরো শতাব্দী পরে বিজ্ঞান এসে তার সত্যতা দিয়েছে।

সূত্র Nettie M. Stevens — *Studies in Spermatogenesis*, 1905

35

ভ্রূণবিদ্যা ও শারীরস্থান

তিন অন্ধকারে

তিনি আপনাদের সৃষ্টি করেন আপনাদের মায়েদের গর্ভে, এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি, তিন অন্ধকারের মধ্যে।

সূরা আয-যুমার — আয়াত 6

তিনটি স্তরে সাজানো পর্দা: পেটের প্রাচীর, তারপর জরায়ুর প্রাচীর, তারপর ভ্রূণের ঝিল্লি

সহজ কথায়

গর্ভের শিশু একটিমাত্র অন্ধকার কামরায় থাকে না — থাকে **তিনটি কামরায়**, একটির ভিতরে আরেকটি: মায়ের পেটের প্রাচীর, তারপর জরায়ুর প্রাচীর, তারপর যে পানির থলি তাকে ঘিরে রাখে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

গর্ভবতী নারীর ব্যবচ্ছেদ হতো না, জরায়ুর গঠন সম্পর্কে কোনো জ্ঞানও ছিল না। স্বাভাবিক ধারণা ছিল, শিশু আছে **একটিমাত্র অন্ধকারে**: তার মায়ের পেটের ভিতরে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে তিনটি অন্ধকার গণনা করা এক সূক্ষ্ম দাবি, যার জন্য স্তরগুলোকে একটি একটি করে জানতে হয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ভ্রূণকে ঘিরে থাকে পরপর তিনটি পর্দা: **পেটের সামনের প্রাচীর**, তারপর তিন পেশিস্তরসহ **জরায়ুর প্রাচীর**, তারপর **ভ্রূণের ঝিল্লিগুলো** (অ্যামনিয়ন ও কোরিয়ন) এবং তাদের মাঝের তরল। প্রতিটিই নিজে নিজেই আলো আটকায়, আর সেগুলো সাজানো বাইরে থেকে ভিতরের দিকে, ঠিক যে ক্রমে বলা হয়েছে সেই ক্রমেই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সংখ্যাই এখানে চূড়ান্ত কথা বলে। কুরআন বলেনি "অন্ধকারে", বলেনি নির্বিশেষে "অন্ধকারসমূহে"; বরং নির্দিষ্ট করেছে: "**তিন**"। সংখ্যার দাবি ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গেই তা মিথ্যা প্রমাণ করা যায়। আর তার সঙ্গে এসেছে আরও একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বাক্যাংশ: "এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি" — অর্থাৎ পরপর আসা পর্যায়, প্রতিটি আগেরটির পরে সৃষ্ট। তাই একটিমাত্র আয়াতে একসঙ্গে এসেছে **স্থানের স্তরবিন্যাস** আর **সময়ের পর্যায়ক্রম**।

সূত্র Moore & Persaud – amnion, chorion, decidua

ভ্রূণবিদ্যা

36 মুদগাহ — যে টুকরায় দাঁতের ছাপ

তারপর একটি মাংসপিণ্ড থেকে, পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি — যাতে আমি আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে দিই।

সূরা আল-হজ্জ — আয়াত 5

চতুর্থ সপ্তাহের ভ্রূণ: ফুটে ওঠা সোমাইট, যেন চিবানো কোনো বস্তুতে দাঁতের ছাপ

সহজ কথায়

আরবি শব্দ *মুদগাহ*-র অর্থ **যে লোকমা আপনি নিজের দাঁতে চিবিয়েছেন**। এই পর্যায়ে ভ্রূণ একটি ছোট পিণ্ড, যার গায়ে ফোলা আর খাঁজ — ঠিক যেমন চিবানো আঠায় দাঁতের দাগ পড়ে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এই পর্যায় সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। কল্পনা করার যেকোনো চেষ্টা ভ্রূণকে বলত হয় রক্ত, নয়তো ক্ষুদ্র এক মানুষের প্রতিকৃতি। কিন্তু তাকে **দাঁতের ছাপ লাগা চিবানো একটি বস্তু** বলা এমন এক বিস্ময়কর বর্ণনা, যা না দেখে কারও মাথায় আসে না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

চতুর্থ সপ্তাহে ভ্রূণের পিঠ বরাবর পরপর কতগুলো খণ্ড ফুটে ওঠে, যাদের বলা হয় **সোমাইট**, আর তাদের মাঝে থাকে গভীর খাঁজ — ফলে ভ্রূণকে দেখায় চিবানো এক টুকরার মতো। ভ্রূণবিজ্ঞানী কিথ মুর এই পর্যায়ের ভ্রূণের পাশে চিবানো এক টুকরো আঠার ছবি তুলেছিলেন, আর মিলটি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই খণ্ডগুলোর কিছু অঙ্গে রূপ নেয়, কিছু মিলিয়ে যায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

চূড়ান্ত কথা **শব্দের নির্বাচনে**। সেই যুগে বর্ণনাকারীর সামনে পথ ছিল দুটি, তৃতীয় কোনো পথ ছিল না: হয় বলা যে এটি **রক্ত**, নয়তো বলা যে এটি **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণ ক্ষুদ্র এক মানুষ** — আর এই দুটি মতই তখন দুনিয়াজুড়ে প্রচলিত ছিল। অথচ তিনি আনলেন তৃতীয় একটি কথা, যা কারও মাথাতেই আসে না: **চিবানো এক লোকমা, যার গায়ে দাঁতের ছাপ**। এটি কথার কারুকাজ নয়, কারণ তারা যা কল্পনা করত তার কোনোটির সঙ্গেই এর মিল নেই — আর এ কথায় কেবল সে-ই পৌঁছায়, যে তা দেখেছে।

আর এটি একা দাঁড়ানো কোনো একটি শব্দও নয়, বরং **একটি ধারাবাহিকতার কড়ি**: নুতফা, তারপর আলাকা, তারপর মুদগাহ। তিনটি সাধারণ আরবি শব্দ, প্রতিটি নিজ পর্যায়ে অণুবীক্ষণ যা দেখায় তা-ই বর্ণনা করে, **এবং যে ক্রমে তা সত্যিই ঘটে ঠিক সেই ক্রমেই**।

আর একটি সীমায় থামুন: প্রচলিত আছে যে "পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি" অর্থ কোষের বিভেদীকরণ আর তাদের কিছুর নির্ধারিত মৃত্যু। **আমরা এখানে তার উপর কিছুই দাঁড় করাই না**: ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শাবি ও ইবনে মাসউদ থেকে যা বর্ণিত তা হলো, পূর্ণাকৃতি সেটিই যা **সৃষ্টিতে পূর্ণ**, আর অপূর্ণাকৃতি হলো **গর্ভপাতে পড়ে যাওয়া**; আয়াতের প্রসঙ্গও তা-ই সমর্থন করে, কেননা এরপরই আসে: "**আর আমি জরায়ুতে যা ইচ্ছা তা স্থির রাখি**"। প্রমাণ দাঁড়িয়ে আছে কেবল "মুদগাহ" শব্দটির উপর — আর যা প্রতিষ্ঠিত নয় তা ফিরিয়ে দিলে তার কিছুই ক্ষতি হয় না; বরং এটিই তাকে প্রমাণ বানায়।

সূত্র الدُّرَرُ السَّنِيَّة – تفسيرُ سورة الحجّ ٥ · Moore & Persaud – the somites · O'Rahilly & Müller – *Developmental Stages in Human Embryos*

প্রাণের উৎস

৩৭ প্রতিটি জীবন্ত বস্তু — পানি থেকে

আর আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি প্রতিটি জীবন্ত বস্তু। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

সূরা আল-আম্বিয়া — আয়াত ৩০

আজ পর্যন্ত জানা প্রতিটি জীবের পানি লাগে, তা ছাড়া তার টিকে থাকা সম্ভব নয়

সহজ কথায়

প্রতিটি জীবন্ত বস্তু — মানুষ, পশু, গাছ, এমনকি ক্ষুদ্রতম জীবাণুও — **পানি থেকেই**, আর পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। আপনার নিজের শরীর প্রায় ৬০ শতাংশ পানি — আর জন্মের দিনে ছিল প্রায় ৭৮ শতাংশ।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

শুকনো এক মরুভূমিতে, যেখানে পানি দুর্লভ আর বেশির ভাগ জমিই বালু ও পাথর, সবচেয়ে অসম্ভব যে কথাটি কারও মনে আসতে পারত তা হলো — পানিই **প্রতিটি** জীবন্ত বস্তুর মূল। দার্শনিকেরা বস্তুর মূল নিয়ে তর্ক করেছেন — আগুন, বাতাস, মাটি, পানি — আর কারও কাছেই বিষয়টি চুকিয়ে দেওয়ার মতো প্রমাণ ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

জীবিত কোষ — গোটা প্রাণের একক — ভরের হিসাবে প্রায় ৭০ শতাংশ পানি, আর প্রতিটি জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার ভেতরেই। আজ পর্যন্ত একটিও জীব জানা নেই, যার পানি ছাড়া চলে। এ কারণেই অন্য কোনো গ্রহে প্রাণ খুঁজতে গিয়ে মহাকাশ সংস্থাগুলো সবার আগে খোঁজে **পানি** — তাদের ঘোষিত স্লোগানই হলো: "পানিকে অনুসরণ করুন।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

অলৌকিকত্ব লুকিয়ে আছে **"প্রতিটি"** শব্দটিতে। আয়াত বলেনি যে পানি প্রাণের একটি কারণ, বলেনি যে বেশির ভাগ জীব পানি থেকে — বরং পানিকেই বানিয়েছে ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর মূল। আর এ হলো **সর্বজনীন এক নিয়ম, তাই মিথ্যা-প্রমাণযোগ্যও**: পানি লাগে না এমন একটিমাত্র জীব পাওয়া গেলেই তা ভেঙে পড়ত। বিজ্ঞান চৌদ্দ শতাব্দী ধরে পৃথিবীর প্রতিটি পরিবেশে খুঁজেছে — বরফে, আগ্নেয় ছিদ্রমুখে, সমুদ্রের গভীরে, পারমাণবিক চুল্লির ভেতরে — একটি ব্যতিক্রমও পায়নি।

সূত্র Alberts et al. – *Molecular Biology of the Cell*

প্রাণরসায়ন

38

সবুজ গাছের ভেতরে জমা আগুন

তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ গাছ থেকে আগুন বানিয়েছেন, আর দেখো, তোমরা তা থেকেই আগুন জ্বালো।

সূরা ইয়াসিন — আয়াত ৪০

গাছ সূর্যের আলো নিজের ভেতরে জমা করে, আর আগুন তা আবার ছেড়ে দেয়

সহজ কথায়

কাঠে যে আগুন জ্বলে তা নতুন নয় — তা **সূর্যের সেই আলোই**, গাছ যখন সবুজ ও জীবিত ছিল তখন যা সে জমিয়ে রেখেছিল। আপনি যখন কাঠ জ্বালান, তখন আপনি পুরোনো এক বন্দি সূর্যকে মুক্ত করে দিচ্ছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সবুজ আর ভেজা তো প্রত্যেক মনেই আগুনের উল্টো: সবুজ ডাল জ্বলে না, শুকনো ডাল জ্বলে। তাই আগুনকে বিশেষভাবে **"সবুজ গাছের"** সঙ্গে জুড়ে দেওয়া রোজকার চোখে-দেখার বিরুদ্ধেই যেত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সালোকসংশ্লেষণ: সবুজ পাতা সূর্যের আলোর ফোটন ধরে ফেলে আর সেগুলোকে বদলে দেয় শর্করা ও সেলুলোজ অণুর বন্ধনে জমা রাসায়নিক শক্তিতে। আর দহন হলো ঠিক তার উল্টো প্রক্রিয়া: তা ওই বন্ধনগুলো ভেঙে শক্তিকে আলো ও তাপ হিসেবে ছেড়ে দেয়। আমরা যত জ্বালানি কাজে লাগাই — কাঠ, কয়লা, তেল, গ্যাস — সবই কোনো সবুজ গাছের জমানো সৌরশক্তি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

নির্দিষ্ট করে বলাটাই এখানে অলৌকিক। আয়াত বলেনি "গাছ থেকে আগুন", বলেছে "**সবুজ** গাছ থেকে" — আর সবুজ থাকাটাই ঠিক সেই অবস্থা, যাতে সালোকসংশ্লেষণ ও সঞ্চয় ঘটে। অর্থাৎ আগুনকে জোড়া হয়েছে সেই ধাপের সঙ্গে, যাতে শক্তি **জমা হয়**; যে ধাপে তা পোড়ে, সেটির সঙ্গে নয়। শুকনো কাঠ কেবল সেটুকুর জোরেই জ্বলে, সবুজ থাকতে যা সে জমিয়েছিল। এ এক অবস্থা ও এক ফলের মধ্যে পুরোপুরি সঠিক কার্যকারণ-সম্পর্ক, যা বোঝাই যায়নি 1817 সালে ক্লোরোফিল আবিষ্কারের আগে।

সূত্র Pelletier & Caventou (1817) – chlorophyll · Taiz & Zeiger – *Plant Physiology*

ফরেনসিক বিজ্ঞান

39 আঙুলের ছাপ — আপনার একমাত্র পরিচয়

মানুষ কি মনে করে আমি তার হাড়গুলো একত্র করতে পারব না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই — আমি তার আঙুলের ডগাগুলো পর্যন্ত ঠিকঠাক গড়ে দিতে সক্ষম।

সূরা আল-কিয়ামাহ — আয়াত 3-4

দুটি আঙুলের ছাপ কখনো মেলে না — অভিন্ন যমজেরও নয়

আটশ কোটি মানুষ... আটশ কোটি আলাদা আঙুলের ছাপ

সহজ কথায়

আপনার আঙুলের ডগায় সূক্ষ্ম রেখা আছে। এই রেখা **অন্য কোনো মানুষের মধ্যে কখনোই পুনরাবৃত্ত হয় না** — এমনকি সেই অভিন্ন যমজেও নয়, যে বাকি সব কিছুতে আপনারই মতো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আঙুলের ডগা ছিল চামড়ার সাধারণ এক টুকরা; কেউ সেদিকে তাকাত না, কেউ তাকে স্বতন্ত্র ভাবত না। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ কাদামাটিতে ও চুক্তিপত্রে আঙুল চেপে তাকে ব্যক্তিগত সিলমোহর বানিয়েছে, কিন্তু কেউ জানত না যে সেগুলো **অনন্য, কখনো পুনরাবৃত্ত হয় না**, কিংবা সারা জীবন অটল থাকে। পরিচয় শনাক্ত করতে আঙুলের ছাপ সরকারিভাবে ব্যবহৃত হয়নি 1892 সাল পর্যন্ত — আর তা আর্জেন্টিনায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আঙুলের ডগার রেখা তৈরি হয় গর্ভধারণের দশম সপ্তাহে, জিন আর জরায়ুর ভিতরে অ্যামনিয়োটিক তরলের চাপের এক জটিল মিথস্ক্রিয়ায় — আর তা বেরিয়ে আসে **সম্পূর্ণ অনন্য** হয়ে। সারা জীবন তা অটল থাকে — বদলায় না, মুছে ফেলা যায় না, উপরের চামড়া পুড়ে গেলেও আগের মতোই ফিরে আসে। গোটা দুনিয়ার পরিচয়-ব্যবস্থা এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

প্রসঙ্গটিই এখানে চাবিকাঠি। আয়াত কথা বলছে মৃতদের পুনরুত্থান আর হাড় একত্র করা নিয়ে। যে একে অসম্ভব মনে করে, তার উত্তরে প্রত্যাশিত ছিল: হ্যাঁ, আমি তার হাড়গুলো একত্র করতে সক্ষম। কিন্তু উত্তর এল আরও অনেক সূক্ষ্ম কিছু নিয়ে: "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই — আমি তার **আঙুলের ডগাগুলো** পর্যন্ত ঠিকঠাক গড়ে দিতে সক্ষম।" দেহের সমস্ত অংশের মধ্য থেকে ঠিক **আঙুলের ডগাকেই** বেছে নেওয়া — আর তা-ও ঠিক সেখানে, যেখানে কথা হচ্ছে কোনো কিছুকে **হুবহু আগের মতোই** ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা নিয়ে — স্বাতন্ত্র্য ও পরিচয়ের আসনের দিকেই ইঙ্গিত। আর এ কথা জানা যায়নি আরও বারো শতাব্দী পর্যন্ত।

সূত্র Galton – *Finger Prints*, 1892 · Juan Vucetich – the first fingerprint identification, 1892

উড্ডয়নের বিজ্ঞান

40 ডানা মেলে, আবার গুটিয়ে

তারা কি তাদের উপরে পাখিদের দেখে না — ডানা মেলে, আবার গুটিয়ে? দয়াময় ছাড়া আর কেউ তাদের ধরে রাখে না।

সূরা আল-মুলক — আয়াত 19

মেলা ডানায় ভেসে চলা আর গুটানো ডানায় ঝাপটানো: পৃথিবীর সব উড়ালই এ দুটির একটি

সহজ কথায়

পাখি ওড়ে কেবল দুই রকমে: হয় **ডানা দুটি মেলে** দিয়ে নাড়াচাড়া ছাড়াই বাতাসে ভেসে চলে, নয়তো **ডানা গুটিয়ে** ঝাপটে নিজেকে সামনে ঠেলে দেয়। কুরআন দুটিরই নাম নিয়েছে, তৃতীয় কিছু যোগ করেনি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ওড়া ছিল দেখার দৃশ্য, বিশ্লেষণের বিষয় নয়। উড়ালের দুই ধরনের মধ্যে কেউ পার্থক্য করত না, কোনটি উত্তোলন দেয় আর কোনটি সামনের ধাক্কা দেয় তাও জানত না। শত শত বছর মানুষ ডানা ঝাপটানোর নকল করে উড়তে চেয়েছে, আর ব্যর্থ হয়েছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বায়ুগতিবিদ্যা পাখির উড়ালকে দুই ধরনে ভাগ করে, তৃতীয় কোনো ধরন নেই: স্থির মেলা ডানায় **ভেসে চলা ও চক্কর দেওয়া**, যা উপরে ওঠা বায়ুস্রোতকে কাজে লাগায়; আর **ঝাপটানো উড়াল**, যাতে ডানা গুটিয়ে ও মেলে সামনের ধাক্কা তৈরি হয়। আজ পর্যন্ত বানানো প্রতিটি উড়োজাহাজ প্রথম নীতিটির উপরেই দাঁড়ানো — স্থির, মেলা ডানা। মানুষ উড়তে সফল হয়েছে কেবল তখনই, যখন সে ঝাপটানোর নকল ছেড়ে মেলাকে গ্রহণ করেছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উড়ালকে দুই ধরনে সীমাবদ্ধ করাই প্রথম সূক্ষ্মতা। দ্বিতীয়টি **শব্দরূপে**: "মেলে" এসেছে কর্তৃবাচক বিশেষণের রূপে, যা স্থির ও অবিরাম অবস্থা বোঝায়; আর "গুটায়" এসেছে বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপে, যা পুনরাবৃত্তি ও বিরতি বোঝায়। ভৌত পার্থক্যটি ঠিক এটিই: মেলা একটি চলমান অবস্থা, গুটানো একটি বারবার ঘটা নড়াচড়া। আর তৃতীয় সূক্ষ্মতা: "মেলে" রাখা হয়েছে "গুটায়"-এর আগে — কারণ মেলা ডানাই সেই ভিত্তি যা উত্তোলন-শক্তি তৈরি করে, আর ঝাপটানো তার উপর একটি বাড়তি সংযোজন।

সূত্র Videler – *Avian Flight*, 2005 · *Britannica* – "Flight (animal locomotion)"

ক্ষত-চিকিৎসা

41 গুহাবাসীদের পাশ ফেরানো — আর শয্যাক্ষত প্রতিরোধ

আর আপনি তাদের জাগ্রত মনে করতেন, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত। আর আমি তাদের ডানে ও বামে পাশ ফিরিয়ে দিতাম।

সূরা আল-কাহফ — আয়াত 18

আজ দুনিয়ার প্রতিটি হাসপাতালে শয্যাপাশে সেবার নিয়মাবলি

সহজ কথায়

গুহাবাসীরা ঘুমিয়েছিল খুব দীর্ঘ সময়, আর আল্লাহ **তাদের ডানে ও বামে পাশ ফিরিয়ে দিতেন**। চিকিৎসাবিজ্ঞান আজ বলে: যে রোগী নড়াচড়া ছাড়া পড়ে থাকেন, **তাঁর চামড়ায় ঘা হয় আর মাংস পচে যায়** — আর এর একমাত্র প্রতিকার পাশ ফেরানো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের চোখে ঘুম ছিল নিছক বিশ্রাম, যত দীর্ঘই হোক ক্ষতি নেই। জানা ছিল না যে **দেহকে একই ভঙ্গিতে স্থির রাখলে** কলা নষ্ট হয়ে যায়। তাই দীর্ঘ ঘুমের গল্পে পাশ ফেরানোর উল্লেখকে মনে হয়েছিল অপ্রয়োজনীয় এক খুঁটিনাটি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

শয্যাক্ষত (Bedsores / Pressure Ulcers): দেহের ভার একই জায়গায় চাপ দিলে সেখানে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে কোষ মরে যায়, চামড়ায় ঘা হয়, তারপর পেশিতে, তারপর হাড়ে। পুরোপুরি স্থির থাকার **মাত্র দুই ঘণ্টার** মধ্যেই ক্ষয় শুরু হয়। দীর্ঘ শয্যাশায়িত্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক জটিলতাগুলোর একটি এটি, এবং এতে মৃত্যুও হতে পারে। বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত প্রতিরোধ: **রোগীকে ডানে ও বামে পাশ ফেরানো**, তাঁর অবস্থা অনুযায়ী বানানো সময়সূচি মেনে — প্রতি দুই থেকে তিন ঘণ্টায় একবার।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, আয়াতটি পাশ ফেরানোর কথা অনর্থক বলেনি, গল্পের অলংকার হিসেবেও বলেনি। তা এসেছে **তাদের দেহ কীভাবে রক্ষা পেল** — সেই দীর্ঘ সময় জুড়ে — তা বোঝানোর প্রসঙ্গে। আর এর জন্য জানা থাকতে হয় যে স্থির দেহ নষ্ট হয়ে যায়, আর **পাশ ফেরানোই তার প্রতিকার**। শব্দের নিখুঁততা আরও বেশি: "ডানে ও বামে" — চিকিৎসাবিজ্ঞান ঠিক এই পাশ-ফিরে-শোয়ার ভঙ্গিরই পরামর্শ দেয় (30 ডিগ্রি কাত অবস্থান), কারণ তাতে চাপ সরে যায় ত্রিকাস্থি ও নিতম্ব থেকে, যা সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাগুলোর অন্যতম (আর গোড়ালির জন্য আলাদা অবলম্বন থাকে, যা তাকে বিছানা থেকে তুলে রাখে)। তারপর একই আয়াতে আরেকটি খুঁটিনাটি: "**আর তাদের কুকুর গুহামুখে দুই থাবা মেলে দিয়ে ছিল**" — দুই থাবা মেলে দেওয়া বিশ্রামের ভঙ্গি, পাহারার নয়; কুকুরের শোয়া দীর্ঘ হলে সে এমনটিই করে।

সূত্র EPUAP · NPIAP – *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers*

লোহা — নাজিল হয়েছে, এখানে তৈরি হয়নি

আর আমি লোহা নাজিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি আর মানুষের জন্য নানা উপকার।

সূরা আল-হাদিদ — আয়াত 25

পৃথিবীর — আর আপনার রক্তের — প্রতিটি লোহার পরমাণু জন্মেছে কোনো নক্ষত্রের ভিতরে

সহজ কথায়

পৃথিবীর সমস্ত লোহা, এমনকি আপনার রক্তের লোহাটুকুও এখানে তৈরি হয়নি। তা এসেছে **মহাশূন্যে দানব নক্ষত্রের বিস্ফোরণ** থেকে, তারপর পৃথিবীতে পড়েছে। আর কুরআন বলেনি "আমি লোহা সৃষ্টি করেছি"; বলেছে: **"আমি নাজিল করেছি"**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের চোখে ধাতু মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে তোলা হয়, তাই তা পৃথিবীরই এবং পৃথিবীরই জাতের। কোনো একটি নির্দিষ্ট ধাতু যে **এই গ্রহের বাইরে থেকে আসতে পারে**, এমন ধারণাই কারও ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নক্ষত্রের ভিতরকার নিউক্লীয় সংযোজন লোহা পর্যন্ত মৌলগুলো তৈরি করে — তারপর সেখানেই থেমে যায়, কারণ লোহাই নিউক্লীয় বন্ধন-শক্তির চূড়া: তার চেয়ে হালকা মৌলের সংযোজন শক্তি ছাড়ে, **আর তার চেয়ে ভারী মৌল গড়তে শক্তি খরচ হয়, উৎপন্ন হয় না**। তাই সাধারণ কোনো নক্ষত্রের পক্ষে লোহার চেয়ে ভারী কিছু বানানো সম্ভব নয়। কেবল সুপারনোভা বিস্ফোরণই লোহাকে মহাশূন্যে ছুড়ে দেয়। আমাদের গ্রহ আর তার সমস্ত লোহা জমাট বেঁধেছে সেই নাক্ষত্রিক ধুলো থেকে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কুরআন "নাজিল করা" ক্রিয়াটি বিশেষভাবে লোহার সঙ্গেই ব্যবহার করেছে, আর তাও এমন এক প্রসঙ্গে যেখানে রাসূলদের পাঠানো আর কিতাব নাজিল করার কথা হচ্ছে — অর্থাৎ যা **উপর থেকে** আসে তারই প্রসঙ্গে। আর ভৌত বাস্তবতা আক্ষরিক অর্থেই তা-ই। এর সঙ্গে যোগ করুন, লোহার পারমাণবিক সংখ্যা 26 আর ভরসংখ্যা 56, সূরা আল-হাদিদ কুরআনের 57তম সূরা, আর প্রচলিত গণনায় এটি 25 নম্বর আয়াত। তবু সবচেয়ে শক্ত প্রমাণ একটি শব্দই থেকে যায়: "আমি নাজিল করেছি।"

সূত্র Burbidge, Burbidge, Fowler & Hoyle (1957) — *Synthesis of the Elements in Stars* · Nobel Prize in Physics 1983

43

শিশুচিকিৎসা

দুগ্ধদানের দুই পূর্ণ বছর

আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবেন — যে দুগ্ধদানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় তার জন্য।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত 233

কুরআন — 1400 বছর আগে	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
24 মাস	**24 মাস**
"পূর্ণ দুই বছর"	"দুই বছর বা বেশি"
যে পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য	বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত সুপারিশ

একই সংখ্যা… চৌদ্দ শতাব্দীর ব্যবধানে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ মেয়াদে ও নীতিতে আয়াতের সঙ্গে মিলে যায়

সহজ কথায়

কুরআন পূর্ণ দুগ্ধদানের মেয়াদ নির্ধারণ করেছে **দুই পূর্ণ বছর**। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আজ ঠিক সেই একই মেয়াদেরই সুপারিশ করে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

দুগ্ধদানের মেয়াদ জাতিভেদে প্রথা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিস্তর আলাদা ছিল — কয়েক মাস থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত, কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়াই। শিশুর বৃদ্ধি ও রোগপ্রতিরোধের জন্য আদর্শ মেয়াদ জানার কোনো উপায়ই ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ সুপারিশ করে **ছয় মাস কেবল মায়ের দুধ**, তারপর বাড়তি খাবারের সঙ্গে তা চালিয়ে যাওয়া **দুই বছর বা তারও বেশি পর্যন্ত**। প্রমাণিত হয়েছে যে মায়ের দুধ এমন অ্যান্টিবডি বহন করে যা শিশুর রোগপ্রতিরোধ গড়ে তোলে, তা শিশুমৃত্যু, সংক্রমণ ও ডায়াবেটিস কমায়, আর উন্নততর মানসিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সূক্ষ্মতা কেবল সংখ্যায় নয়, বরং **তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া শর্তে**: "যে দুগ্ধদানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় তার জন্য"। আয়াত দুই বছরকে কঠোর বাধ্যবাধকতা করেনি; করেছে **পূর্ণতার সুপারিশকৃত ঊর্ধ্বসীমা** — আর আধুনিক চিকিৎসা-সুপারিশের ভাষাও ঠিক এটিই ("দুই বছর বা তারও বেশি", "দুই বছর বাধ্যতামূলক" নয়)। এরপর আয়াত আরও শিথিলতা যোগ করেছে: পিতামাতা উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শে আগেভাগে দুধ ছাড়ানো বৈধ, আর অন্য নারীকে দিয়ে দুধ পান করানোও বৈধ। সংখ্যায় আর সুপারিশের মর্মে — দুদিক থেকেই এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে।

সূত্র WHO & UNICEF – *Global Strategy for Infant and Young Child Feeding*

44 খেজুর গাছের কাণ্ড নিজের দিকে নাড়া দিন

আর খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন; তা আপনার উপর ঝরিয়ে দেবে সুপক্ক তাজা খেজুর। সুতরাং খান, পান করুন এবং চোখ জুড়ান।

সূরা মারইয়াম — আয়াত 25-26

গর্ভের শেষ সপ্তাহগুলোতে ও প্রসবের পরে আজ খেজুরের সুপারিশ করা হয়

সহজ কথায়

এক নারী খেজুর গাছের নিচে একা সন্তান প্রসব করছেন, আর তাঁকে বলা হচ্ছে: **তাজা খেজুর খান**। আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, প্রসবের সময় ও তার পরে নারী যা খেতে পারেন তার মধ্যে খেজুর অন্যতম সেরা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

তাজা খেজুর ছিল পরিচিত ও প্রিয় খাবার, কিন্তু প্রসবে তার কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসাগত ক্রিয়া জানা ছিল না। প্রসূতির জন্য চেনা পরামর্শ ছিল বিশ্রাম, উষ্ণতা আর ঝোল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটিমাত্র ফলকে আলাদা করে নির্দিষ্ট করা এক চোখে পড়ার মতো নির্ধারণ।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পিয়ার-রিভিউড সাময়িকীতে প্রকাশিত ক্লিনিক্যাল গবেষণা প্রমাণ করেছে যে গর্ভের শেষ সপ্তাহগুলোতে খেজুর খাওয়া **প্রসববেদনার সময় কমায় আর প্রসব ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন হ্রাস করে**। খেজুরে আছে দ্রুত শোষিত হওয়া ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ — শক্তি নিঃশেষ হওয়ার পর প্রসূতির ঠিক যা দরকার — আর আছে পটাশিয়াম, লোহা ও ম্যাগনেশিয়াম; আর আছে এমন যৌগ, যা **অক্সিটোসিনের** মতো কাজ করে জরায়ুকে সংকুচিত হতে সাহায্য করে ও রক্তক্ষরণ কমায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে তিনটি বিষয় লক্ষ করুন। প্রথম: ফল নির্দিষ্ট — খেজুরই, অন্য কিছু নয়; এই অবস্থার জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে উপযুক্ত খাদ্য। দ্বিতীয়: অবস্থাও নির্দিষ্ট — "**সুপক্ক তাজা খেজুর**", নরম ও টাটকা, শুকনো নয়; যা দ্রুত শোষিত হয় আর সহজে হজম হয়। তৃতীয়, এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর: **কাণ্ড নাড়ার** নির্দেশ — চরম দুর্বলতার মুহূর্তে এক নারীকে নড়াচড়া ও শ্রমের আদেশ দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রসববেদনার সময় নড়াচড়ার সুপারিশ করে ঠিক এ কারণেই যে তা প্রসবকে দ্রুততর করে। খাদ্য, নড়াচড়া আর প্রশান্ত মন ("চোখ জুড়ান") — একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোটোকল।

সূত্র Al-Kuran et al. (2011) – date fruit in late pregnancy · Guyton & Hall – oxytocin and the uterus

45

প্রবাহিত রক্ত আর শূকরের মাংস কেন হারাম হলো?

আপনি বলুন: আমার প্রতি যা ওহি করা হয়েছে তাতে আমি ভক্ষণকারীর জন্য হারাম এমন কিছু পাই না — তবে তা যদি হয় মৃত প্রাণী, কিংবা প্রবাহিত রক্ত, কিংবা শূকরের মাংস; কারণ তা অপবিত্র।

সূরা আল-আনআম — আয়াত 145

তিন নিষেধ... আর তিন কারণ, যা চিকিৎসাবিজ্ঞান শতাব্দী পরে প্রমাণ করেছে

নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার কারণ জানার চৌদ্দ শতাব্দী আগে

সহজ কথায়

কুরআন তিনটি খাদ্য হারাম করেছে: প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস, আর যে প্রাণী নিজে নিজেই মরে গেছে। আর আজ বিজ্ঞান দেখাচ্ছে, এদের প্রতিটিই **রোগের পরিচিত বাহক**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

খাদ্য বাছাই হতো প্রথা, রুচি আর প্রাপ্যতা দিয়ে। পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া কিংবা প্রাণী থেকে মানুষে রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিল না। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতায় শূকরের মাংস খাওয়া হতো কোনো দ্বিধা ছাড়াই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

রক্ত ব্যাকটেরিয়া বেড়ে ওঠার আদর্শ মাধ্যম, আর তা বিপাকীয় বর্জ্য, হরমোন ও বিষ বহন করে বৃক্কের দিকে। **শূকরের মাংস** ট্রাইকিনেলা কৃমির প্রধান বাহক, যা পেশিতে সিস্ট বেঁধে থাকে আর হালকা রান্নায় বেঁচে যায়; বাহক শূকরের ফিতাকৃমিরও, যার লার্ভা মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে; আর টক্সোপ্লাজমারও — এর সঙ্গে আছে উঁচু মাত্রার সম্পৃক্ত চর্বি। **মৃত প্রাণী** রোগে বা বিষে মরে থাকতে পারে, আর তার রক্ত আটকে থাকে কলার ভিতরেই, তাই তা দ্রুত পচে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সূক্ষ্ম শর্তটি হলো "**প্রবাহিত**"। নিষেধাজ্ঞা সব রক্তের উপর পড়েনি, পড়েছে জবাইয়ের সময় ঝরে পড়া প্রবহমান রক্তের উপর। আর যা কলার ভিতরে মিশে থেকে যায় — মায়োগ্লোবিন — তা রেহাই পেয়েছে; তা সরানোর কোনো উপায়ও নেই। নিষেধাজ্ঞাটি **এমন বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় মাপা, যা কম পড়ে না, বাড়াবাড়িও করে না**। জবাইয়ের বিধানও তেমনই: তাতে গলার শিরা কাটা শর্ত, যাতে সমস্ত রক্ত ঝরে যায় — আর মাংস-নিরাপত্তার মানদণ্ড আজ ঠিক এটিরই সুপারিশ করে, ব্যাকটেরিয়ার ভার কমাতে। এমন এক বিজ্ঞানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ বিধান, যে বিজ্ঞান তখনো জন্মায়ইনি।

সূত্র CDC – *Trichinellosis* · WHO – *Taeniasis / cysticercosis*

46

কীটতত্ত্ব

পিঁপড়া কথা বলে, সতর্কও করে

অবশেষে যখন তারা পিঁপড়ার উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন এক পিঁপড়া বলল: হে পিপীলিকাকুল, তোমরা তোমাদের বাসস্থানে ঢুকে পড়ো, যেন সুলাইমান ও তার বাহিনী তোমাদের পিষে না ফেলে।

সূরা আন-নামল — আয়াত 18

একটি পিঁপড়া তার উপনিবেশকে সতর্ক করে, আর গোটা উপনিবেশ গর্তে ঢুকে পড়ে

সহজ কথায়

ছোট্ট এক পিঁপড়া এগিয়ে আসা বাহিনী দেখে বাকি পিঁপড়াদের সতর্ক করল নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়তে। আর বিজ্ঞান বলছে: পিঁপড়া সত্যিই **বিপদসংকেত পাঠায়**, আর গোটা উপনিবেশ সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পুরোনো ধারণায় প্রাণী ছিল বাকশক্তিহীন এক জীব, যার না আছে ভাষা, না সংগঠন। একটি পিঁপড়ার মুখ থেকে এমন একটি বাক্য বেরোবে যাতে আছে **আহ্বান, আদেশ, সতর্কতা, কারণ আর আক্রমণকারীর জন্য একটি ওজর** ("আর তারা টেরও পায় না") — শ্রোতার কাছে এটি বাস্তব সংবাদের চেয়ে রূপকধর্মী গল্পই মনে হতো।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পিঁপড়া পৃথিবীর সবচেয়ে সুসংগঠিত সামাজিক প্রাণীদের একটি, আর তারা তিনটি প্রমাণিত উপায়ে যোগাযোগ করে: **রাসায়নিক ফেরোমোন** — প্রতিটি বার্তার জন্য আলাদা পদার্থ, আর তার মধ্যে আছে বিপদের ফেরোমোন, যা এমন দ্রুত ছড়ায় যে উপনিবেশ কয়েক সেকেন্ডেই সাড়া দেয়; **টোকা ও কম্পন**; আর **শব্দ** — আবিষ্কৃত হয়েছে যে পিঁপড়ার একটি ঘর্ষণ-অঙ্গ আছে, যা নির্দিষ্ট অর্থবহ শব্দ তৈরি করে; সেগুলো গবেষণাগারে রেকর্ড ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ছোট ছোট খুঁটিনাটিই এখানে প্রমাণ। প্রথমত: ক্রিয়াপদ "**বলল**" এসেছে স্ত্রীলিঙ্গে — আর যে শ্রমিক পিঁপড়ারা বাইরে বেরোয়, পাহারা দেয় আর সতর্ক করে, তারা **সবাই স্ত্রী**; পুরুষদের প্রজনন ছাড়া কোনো কাজ নেই, এরপর তারা মরে যায়। দ্বিতীয়ত: "**তোমাদের বাসস্থানে**" প্রবেশের আদেশ — আর পিঁপড়ার বাসা সত্যিই একটি বাসস্থান, কক্ষ, সুড়ঙ্গ আর ভাণ্ডারে ভাগ করা। তৃতীয়ত: "যেন তোমাদের পিষে না ফেলে" — আরবি ক্রিয়াটির অর্থ ভেঙে ফেলা, আর পিঁপড়ার দেহ একটি শক্ত বহিঃকঙ্কাল, যা **থেঁতলায় না, ভাঙে**। একটিমাত্র আয়াতে তিনটি সূক্ষ্মতা।

সূত্র Hölldobler & Wilson – *The Ants*, 1990 · Ant communication – pheromones and stridulation

47 তিনশো বছর, আর তার সঙ্গে আরও নয়

> আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশো বছর, আর তারা নয় বাড়িয়ে নিল।
>
> সূরা আল-কাহফ — আয়াত 25

তিন শতাব্দীতে দুই পঞ্জিকার ব্যবধান পূর্ণসংখ্যায় ঠিক নয় বছর

সহজ কথায়

কুরআন বলেছে তারা ছিল **তিনশো বছর**, তারপর যোগ করেছে: **"আর তারা নয় বাড়িয়ে নিল"**। কারণটি চমৎকার: তিনশো সৌর বছর সমান 309.2 চান্দ্র বছর — অর্থাৎ পূর্ণসংখ্যায় তিনশো নয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ একটিই পঞ্জিকা ব্যবহার করত, দুই পঞ্জিকার মধ্যে রূপান্তর করত না। একটি পূর্ণ সংখ্যার পরে "নয়" জুড়ে দেওয়াকে মনে হতো অদ্ভুত ও অর্থহীন এক বাড়তি — কোনো কোনো পাঠক তো একে সংখ্যা নিয়ে দ্বিধা বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সৌর বছর 365.2422 দিন, আর চান্দ্র বছর 354.367 দিন। সুতরাং তিনশো সৌর বছর = 109,572.6 দিন। একে চান্দ্র বছরের দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় **309.2** চান্দ্র বছর। অর্থাৎ পূর্ণসংখ্যায় ব্যবধান নয় বছর। গুহাবাসীরা ছিলেন রোমান পরিবেশে, যেখানে সৌর পঞ্জিকা চালু ছিল, আর কুরআন সম্বোধন করছে এমন এক জাতিকে যারা চান্দ্র পঞ্জিকা ব্যবহার করে — তাই এটি সংখ্যাটি দুই পঞ্জিকাতেই একসঙ্গে দিয়ে দিল।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সংখ্যাটি খেয়ালখুশি মতো হলে "তিনশো বছর" বলে থেমে যেত, কিংবা বলত "তিনশো ও কিছু বেশি"। কিন্তু বাড়তিটুকু এসেছে **ঠিক নয় নির্দিষ্ট করে** — আর সেটিই হুবহু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক রূপান্তরের ফল। আর ভাষাটি লক্ষ করুন: "তিনশো বছর, **আর তারা নয় বাড়িয়ে নিল**" — ক্রিয়াপদটিই দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই নয় তাদের কাটানো আলাদা কোনো সময় নয়, বরং **গণনায় বৃদ্ধি, সময়ে নয়** — অর্থাৎ সময়কাল একটিই, পঞ্জিকা বদলের সঙ্গে সংখ্যাটি বদলে গেছে। হিসাবে ও ভাষায় একসঙ্গে টিকে থাকে, এমন ব্যাখ্যা কেবল এটিই।

সূত্র U.S. Naval Observatory — *Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac*

প্রত্নতত্ত্ব

48 সামুদ — যারা পাহাড় কেটে ঘর বানাত

আর তোমরা পাহাড় কেটে কুশলতার সঙ্গে ঘর বানাও। ... আর তারা পাহাড় কেটে ঘর বানাত, নিরাপদ বোধ করে।

সূরা আশ-শুআরা 149 — ও সূরা আল-হিজর 82

বিশাল সম্মুখভাগ, পাথরের উপর থেকে নিচে কেটে নামানো — একটি ভুলও যেখানে চলে না

সহজ কথায়

কুরআন বলেছে, সামুদ জাতি **তাদের ঘর পাহাড়ের ভেতরে কেটে বানাত** — পাথর গেঁথে গড়ত না, বরং পাহাড়টিকেই খুদে তার ভেতর ঘর বানাত। সেই ঘরগুলো আজও দাঁড়িয়ে আছে, দর্শনার্থীরা তা দেখেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরব উপদ্বীপে পরিচিত নির্মাণ ছিল মাটি, পাথর আর খেজুরপাতা। গোটা এক সভ্যতা পাহাড়ের পেটের ভেতর নিজেদের বাসস্থান কেটে বানাচ্ছে — এ ভাবনা শ্রোতাদের কাছে অচেনা ছিল। আর কুরআন নাম ধরে এমন এক জাতির কথা বলেছে, তাওরাতে যাদের উল্লেখ নেই, আর প্রাচীন সূত্রগুলো — সারগনের বর্ষপঞ্জি থেকে ডিওডোরাস ও টলেমি পর্যন্ত — যাদের চিনত কেবল উপদ্বীপের উত্তরের একটি আরব গোত্রের নাম হিসেবে, এই নির্মাণ-কৌশল কেউ তাদের সঙ্গে জুড়ে দেয়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মাদাইন সালিহ (আল-হিজর), উত্তর সৌদি আরবের আল-উলায়: বেলেপাথরে কাটা 130-রও বেশি সম্মুখভাগ, কোনো কোনোটি বিশ মিটারের বেশি উঁচু, সঙ্গে থাম, শীর্ষচূড়া, কার্নিশ এবং সামুদি ও নাবাতি শিলালিপি। 2008 সালে এটি হয় ইউনেস্কোর বিশ্ব-ঐতিহ্য তালিকায় প্রথম সৌদি স্থান। জায়গাটির নাম কুরআনেই আছে: "আর অবশ্যই **হিজরের অধিবাসীরা** রাসুলদের মিথ্যা বলেছিল।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার হয়েছে, সেটিই মীমাংসা করে দেয়: "**তারা কেটে বানায়**", "তারা গাঁথে" নয়। আরবিতে খোদাই মানে নিরেট একটি পিণ্ড থেকে উপাদান সরিয়ে ফেলা — গাঁথুনির ঠিক উল্টো। তারপর নির্দিষ্ট করা: "**পাহাড় থেকে**" — অর্থাৎ পাহাড়টিই ঘরের উপাদান। শ্রোতাদের চারপাশের কোনো কিছুর সঙ্গে মেলে না এমন এক কৌশলের এ এক নিখুঁত বর্ণনা। আর এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে অর্থে ভারী একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য: "**নিরাপদ বোধ করে**" — এমন ঘর ধসে না, পোড়ে না, শত্রুও ভাঙতে পারে না, কারণ তা পাথরটাই। এতেই আয়াতের কথাটি আরও ধারালো হয়: প্রকৌশলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তাও তাদের কোনো কাজে এল না।

সূত্র UNESCO World Heritage List – Hegra (al-Hijr)

49

প্রত্নতাত্ত্বিক শিলালিপি

খাদের অধিবাসীরা — যারা আগুন খুঁড়েছিল

অভিশপ্ত হয়েছে খাদের অধিবাসীরা — ইন্ধনে ভরা সেই আগুনের, যখন তারা তার পাশে বসে ছিল, আর তারা মুমিনদের সঙ্গে যা করছিল তার সাক্ষী ছিল।

সূরা আল-বুরুজ — আয়াত 4-7

ইয়েমেনি শিলালিপি ও সমকালীন সিরিয়াক চিঠিতে নথিভুক্ত এক ঐতিহাসিক গণহত্যা

সহজ কথায়

কুরআন এমন এক জাতির কথা বলেছে, যারা **লম্বা একটি খাদ** খুঁড়ে তাতে আগুন জ্বালাল, তারপর মুমিনদের সেখানে ছুড়ে ফেলে বসে বসে দেখল। এটি সত্যিকারের এক ঐতিহাসিক ঘটনা, পাথরের শিলালিপিতে লেখা আছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এ ঘটনা আরবদের কিতাবপত্রে নির্ভরযোগ্য কোনো বিস্তারিত বিবরণে ছিল না, মক্কায় এর কোনো লিখিত সূত্রও হাতের কাছে ছিল না। এ তো অন্য এক জাতির, আগের এক কালের, আর দূরের এক ভূমির কাহিনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ইতিহাস প্রমাণ করে প্রায় 523 খ্রিস্টাব্দের **নাজরান** গণহত্যার কথা, যখন হিমইয়ারি রাজা **জু নুওয়াস** নাজরানের খ্রিস্টানদের উপর নিপীড়ন চালান এবং যারা ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাদের পুড়িয়ে মারেন। ঘটনাটি নথিবদ্ধ আছে **হিসন গুরাবের শিলালিপিতে**, ঘটনার সমকালীন **শামউন আল-আরশামির সিরিয়াক চিঠিতে**, এবং বাইজেন্টাইন ও হাবশি সূত্রে। আর নাজরানের উত্তরে বিরে হিমায় পাওয়া গেছে হিমইয়ারি 633 সনে তারিখ দেওয়া তিনটি শিলালিপি, যেগুলোতে নিহতের সংখ্যা গোনা হয়েছে বারো হাজার থেকে চৌদ্দ হাজার, আর বন্দির সংখ্যা সাড়ে নয় হাজার থেকে এগারো হাজার।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ছোট ছোট বিবরণের নিখুঁততাই এখানে ফয়সালা করে দেয়। আরবি শব্দ "**উখদুদ**" মানে মাটিতে লম্বা, সোজা একটি ফাটল — গোল গর্ত নয়। আর এটি খোঁড়া পরিখার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মেলে। "**ইন্ধনে ভরা**" বোঝায়, আগুনে বারবার নতুন ইন্ধন জোগানো হচ্ছিল, আচমকা লেগে যাওয়া আগুন নয়। "**তার পাশে বসে ছিল**" আর "**সাক্ষী**": অর্থাৎ অপরাধীরা বসে বসে দেখছিল — এ বিবরণটি শামউনের চিঠির সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে লেখা আছে রাজা নিজে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে হাজির ছিলেন। আর লক্ষ করুন, কুরআন রাজার নামও বলেনি, জাতিরও নাম বলেনি — কারণ উদ্দেশ্য শিক্ষা, ইতিহাস-বিবরণ নয়।

সূত্র *The Book of the Himyarites* – the Najrān persecution, c. 523 CE · The Himyarite Kingdom of south Arabia

50

প্রত্নতত্ত্ব

সাবা এবং বাঁধ-ভাঙা বন্যা

কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিল, তাই আমি তাদের উপর পাঠালাম বাঁধ-ভাঙা বন্যা, আর তাদের দুই বাগান বদলে দিলাম এমন দুই বাগানে, যাতে ছিল বিস্বাদ তেতো ফল আর ঝাউ।

সূরা সাবা — আয়াত 16

মারিবে সেই বিশাল বাঁধের ধ্বংসাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে আছে

সহজ কথায়

ইয়েমেনে **সাবা** নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, যা বেঁচে ছিল এক বিশাল বাঁধের উপর — সেই বাঁধ তার বাগানগুলোতে পানি জোগাত। বাঁধটি ভেঙে পড়ল, বন্যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল, আর বাগানগুলো পরিণত হলো তেতো গাছে, যা খাওয়া যায় না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবদের স্মৃতিতে সাবা বেঁচে ছিল কবিতা ও প্রবাদের একটি নাম হয়ে — "সাবার লোকদের মতো ছিন্নভিন্ন"। কিন্তু খননে পাওয়া কোনো নিদর্শন ছিল না, পাঠযোগ্য কোনো শিলালিপিও না। পশ্চিমা ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ করতেন, এমন রাজ্য আদৌ ছিল কি না — আর একে অর্ধেক কিংবদন্তি গণ্য করতেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মারিব বাঁধ আজও দাঁড়িয়ে থাকা এক নিদর্শন: নির্মিত হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে, দৈর্ঘ্যে প্রায় 600 মিটার, আর তা প্রায় দশ হাজার হেক্টরে পানি জোগাত। এর ভাঙনগুলো নথিবদ্ধ আছে ঘটনাস্থলে পাওয়া **সাবায়ী মুসনাদ শিলালিপিতে** — তার মধ্যে আছে আবরাহার বিখ্যাত শিলালিপি, যা 548 খ্রিস্টাব্দে বাঁধ মেরামতের বর্ণনা দেয়। আর আনুমানিক 570-580 খ্রিস্টাব্দের চূড়ান্ত ভাঙন ডেকে আনে **গোটা গোটা ইয়েমেনি গোত্রের উত্তরমুখী হিজরত** — যে হিজরত আরবদের বংশতালিকা ও ইতিহাসে সুপরিচিত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি কেবল ভাঙনের কথা বলে থামেনি; এরপর সেই জমির কী দশা হলো তা বর্ণনা করেছে উদ্ভিদবিদ্যার নিখুঁত ভাষায়: "এমন দুটি বাগান যাতে ছিল **বিস্বাদ তেতো ফল, ঝাউ আর সামান্য কিছু বরইগাছ**"। প্রথমটি কাঁটাযুক্ত তেতো ঝোপ, দ্বিতীয়টি এক ধরনের ঝাউ, তৃতীয়টি বরই — আর এগুলো হুবহু **শুষ্ক ও লবণাক্ত পরিবেশের উদ্ভিদ**, যা সেচ বন্ধ হয়ে মাটি লোনা হয়ে গেলে চাষের জমি দখল করে নেয়। তারপর বলল: "আর সামান্য **কিছু** বরইগাছ" — ঠিক জায়গায় বসানো এক স্বল্পতাসূচক শব্দ, কারণ তিনটির মধ্যে বরইই সবচেয়ে উপকারী আর সবচেয়ে কম।

সূত্র The Ma'rib Dam and its Sabaean inscriptions · Abraha – the dam-repair inscription (CIH 541)

51

প্রত্নতত্ত্ব

ফেরাউনের দেহ — নিদর্শন হিসেবে রক্ষিত

সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটিকে রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হও।

সূরা ইউনুস — আয়াত 92

তিন হাজার বছরের বেশি পুরোনো এক দেহ... আজও আছে

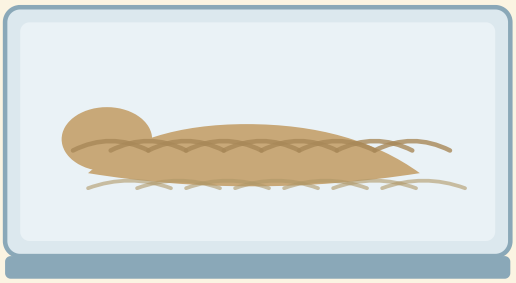

কায়রো জাদুঘর — শাহি মমি-কক্ষ

ফেরাউনের দেহ আজ কাচের পেছনে রাখা, মানুষ নিজ চোখে তা দেখে

সহজ কথায়

ফেরাউন যখন সাগরে ডুবে গেল, আল্লাহ বললেন, তিনি তার **দেহটিকে** রক্ষা করবেন, যাতে পরবর্তীরা তা দেখে শিক্ষা নেয়। সেই দেহ আজ রয়েছে এক জাদুঘরে, যেখানে সারা দুনিয়া থেকে মানুষ এসে দেখে যায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সাগরে যে ডোবে, তার দেহ হারিয়ে যায়: মাছে খায়, নয়তো পচে যায়, নয়তো বালিতে মিলিয়ে যায়। আর আয়াতটি যখন নাজিল হয়, আরবদের কেউ রাজকীয় মমিকরণ বা ফেরাউনদের সমাধি সম্পর্কে কিছুই জানত না। বরং হায়ারোগ্লিফিক লিপিটিই তখন পুরোপুরি বিস্মৃত ছিল, আর তার পাঠোদ্ধার হয়নি 1822 সালের আগে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1881 সালে দাইর আল-বাহরিতে রাজকীয় মমির গুপ্তভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়, তারপর 1898 সালে দ্বিতীয় আমেনহোটেপের সমাধি — এতে সামনে আসে নতুন রাজ্যের ফেরাউনদের দেহ। **মেরনেপতাহ**-র দেহ — যিনি যাত্রার ফেরাউন হওয়ার প্রার্থীদের একজন, যদিও অধিকাংশ গবেষকের মত তিনি দ্বিতীয় রামসেস — রক্ষিত আছে কায়রোর জাদুঘরে। শারীরস্থানবিদ গ্রাফটন এলিয়ট স্মিথ 1907 সালে তার মোড়ক খোলেন এবং এমন এক বৃদ্ধের দেহ বর্ণনা করেন যা মমিকরণে পুরোপুরি অক্ষত রাখা হয়েছে — আজ তা কাচের পেছনে রাখা, দর্শনার্থীরা নিজ চোখে তা দেখেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি কেবল "আমি তোমাকে রক্ষা করব" বলেনি, নির্দিষ্ট করেছে: "**তোমার দেহসহ**" — অর্থাৎ কেবল দেহটি, রুহ নয়। এটি একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য, যা ব্যক্তির রক্ষা পাওয়া আর তার লাশের টিকে থাকার মধ্যে সীমা টানে। তারপর কারণটিও বলেছে: "**যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হও**" — অর্থাৎ দেহটির টিকে থাকাই উদ্দেশ্য, তা দেখানোর জন্যই রাখা। আর এ কথা নাজিল হয়েছে এমন এক মরুভূমিতে যার মানুষ মমি বা সমাধির কিছুই জানত না, সেই সমাধিগুলো খোলা আর তাদের অধিবাসীদের কাচের ঘরে সাজানোর বারো শ বছর আগে।

সূত্র The Deir el-Bahari royal cache (TT320), 1881 · Champollion – decipherment of hieroglyphs, 1822 · The Royal Mummies, Cairo

পাঠের সংরক্ষণ

৫২ যেসব পাণ্ডুলিপি কার্বন প্রমাণ করেছে

> নিশ্চয়ই আমিই এই উপদেশ নাযিল করেছি, আর নিশ্চয়ই আমিই তার সংরক্ষক।
>
> সূরা আল-হিজর — আয়াত ৯

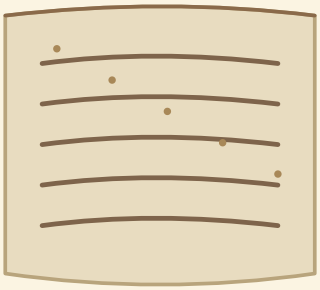

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় — ব্রিটেন

বার্মিংহাম পাণ্ডুলিপি

কার্বন-14 দিয়ে কাল-নির্ণয়

568 – 645 খ্রি.

95% সম্ভাব্যতায়

এর পাঠ আজকের মুসহাফের হুবহু

নবী ﷺ-এর জীবদ্দশার কিংবা তার অল্প পরের চামড়ার পাণ্ডুলিপি — আর তার পাঠই আজকের পাঠ

সহজ কথায়

কুরআন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তা সংরক্ষিত থাকবে, বদলাবে না। আজ আমাদের হাতে আছে **তেজস্ক্রিয় কার্বনে কাল-নির্ধারিত পাণ্ডুলিপি**, যা মোটামুটি নবী ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত পৌঁছে যায় — আর তার পাঠ হুবহু আপনার হাতে থাকা মুসহাফের পাঠ, অক্ষরে অক্ষরে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সব প্রাচীন গ্রন্থই নকল ও অনুবাদের মধ্য দিয়ে সংযোজন, বিয়োজন ও বদলের শিকার হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী হাতে হাতে বাহিত যেকোনো পাঠের এটিই স্বাভাবিক পরিণতি। তাই পূর্ণ সংরক্ষণের দাবি ছিল **এমন এক দাবি, যা যেকোনো ভিন্নমুখী পাণ্ডুলিপি দিয়েই মিথ্যা প্রমাণ করা যেত**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বার্মিংহাম পাণ্ডুলিপি: চামড়ার এই পাণ্ডুলিপি 2015 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্বন-14 দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, আর 95 শতাংশ সম্ভাব্যতায় এর কাল নির্ধারিত হয় **568 থেকে 645 খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে। এরপর সানআ পাণ্ডুলিপি (তার উপরের উসমানি পাঠ), টুবিঙ্গেন পাণ্ডুলিপি, সমরকন্দ মুসহাফ, আর ইস্তাম্বুল ও কায়রোর বড় মুসহাফগুলো। গবেষকেরা — মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই — এসব পাণ্ডুলিপি আজ প্রচলিত মুসহাফের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন, আর পাঠে মিল পাওয়া গেছে প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অক্ষর লেখার বানানগত কিছু পার্থক্য ছাড়া, যা উচ্চারণ বা অর্থ কোনোটিই বদলায় না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সংরক্ষণ কেবল পাণ্ডুলিপির উপর দাঁড়ায়নি, দাঁড়িয়েছে **মানবেতিহাসে অনন্য এক দ্বৈত ব্যবস্থার** উপর: নিখুঁত লিখন, আর **বুকে মুখস্থ রাখা, যা মুতাওয়াতির সূত্রে বাহিত**। প্রতিটি প্রজন্মে দূর দূর দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ গোটা পাঠ মুখস্থ ধরে রাখে, যাদের এক কর্তৃত্বের নিচে জড়ো করার কেউ নেই — তাই একটি অক্ষর বদলানোর ব্যাপারে তাদের একমত হওয়া কার্যত অসম্ভব। আর পাঠটি নিজেই **এই অঙ্গীকার ঘোষণা করেছিল তার সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্তে** — মক্কায় তাড়া খাওয়া একটি দল। কোনো পাঠ চৌদ্দ শতাব্দী ধরে দুটি ভিন্ন অনুলিপি ছাড়াই টিকে আছে — পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রন্থে এর নজির নেই।

সূত্র University of Birmingham – the Mingana Qur'ān folios · Oxford Radiocarbon Accelerator Unit

পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

৫৩ তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছেন: তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, আল্লাহ চাইলে, নিরাপদে, মাথা মুণ্ডিত ও চুল ছাঁটা অবস্থায়, কোনো ভয় ছাড়াই।

সূরা আল-ফাতহ — আয়াত 27

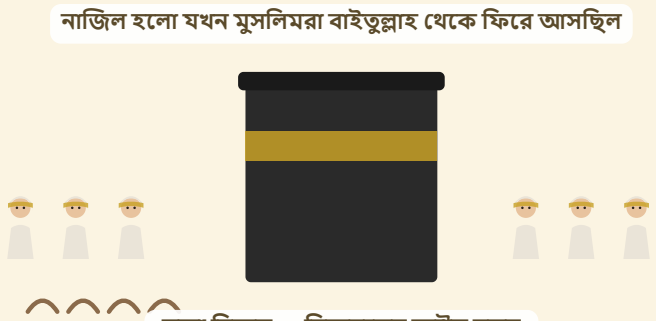

নিরাপদ প্রবেশের প্রতিশ্রুতি... দেওয়া হলো বাধার সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে

সহজ কথায়

মুসলিমদের মক্কায় ঢুকতে দেওয়া হলো না, তাঁরা ভাঙা মন নিয়ে পথ থেকেই ফিরে এলেন। তখন একটি আয়াত নাযিল হলো, যা তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিল যে তাঁরা **নিরাপদে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করবেন**। দুই বছর পর তাঁরা মক্কায় ঢুকলেন বিজয়ী হয়ে, ভয় ছাড়া, যুদ্ধ ছাড়া।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

হিজরি 6 সনে, হুদায়বিয়ায়, মুসলিমদের বাইতুল্লাহ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং কুরাইশের সঙ্গে এমন শর্তে সন্ধি হয়, যা তাঁদের অনেকের কাছেই অন্যায় মনে হয়েছিল — এমনকি উমর বলেই ফেললেন: "আমরা কেন আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এই হীনতা মেনে নেব?" মক্কা তখন তার শক্তির চূড়ায়, আর মুসলিমরা সংখ্যায় ও সরঞ্জামে কম। আসন্ন কোনো বিজয়ের ইঙ্গিত দিগন্তে কোথাও ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হিজরি ৪ সনে (630 খ্রিস্টাব্দে) নবী ﷺ দশ হাজার সঙ্গী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন, **উল্লেখ করার মতো কোনো যুদ্ধ ছাড়াই**, আর ঘোষণা করলেন সাধারণ ক্ষমা: "যাও, তোমরা মুক্ত।" মুসলিমরা নিরাপদে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, মাথা মুণ্ডালেন ও চুল ছাঁটলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে সুনথিবদ্ধ ঘটনাগুলোর একটি, আর সব উৎসই এ ব্যাপারে একমত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতের ছোট ছোট বিবরণগুলোই একে আশা থেকে ভবিষ্যদ্বাণীতে তুলে নেয়। এটি কেবল বলেনি "তোমরা মক্কা জয় করবে", বরং নির্দিষ্ট করেছে **প্রবেশের ধরন**: "**নিরাপদে**" — ভয়ংকর যুদ্ধের পর বিজেতা হিসেবে নয়; "**কোনো ভয় ছাড়াই**" — পূর্ণ নিরাপত্তার উপর জোর; "**মাথা মুণ্ডিত ও চুল ছাঁটা অবস্থায়**" — অর্থাৎ তাঁরা প্রশান্ত মনে পুরো আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন, যা কেবল শহরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলেই সম্ভব। একটিমাত্র বাক্যে চারটি বিবরণ, আর প্রতিটিই ঘটে গেল।

কবুল হওয়া দোয়া

54

যে উপত্যকায় কোনো ফসল নেই — আজ পৃথিবীর সবচেয়ে ভিড়ের জায়গা

হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কিছুকে বসবাস করালাম ফসলহীন এক উপত্যকায়, আপনার পবিত্র ঘরের কাছে ... সুতরাং মানুষের মধ্য থেকে কিছু হৃদয়কে তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন, আর ফলমূল থেকে রিযিক দিন।

সূরা ইবরাহিম — আয়াত 37

যে মাটিতে কিছুই জন্মায় না... সেখানেই মেলে সারা দুনিয়ার ফল

সহজ কথায়

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর স্ত্রী ও শিশুকে এমন এক উপত্যকায় রেখে আসার সময় দোয়া করলেন, যেখানে **পানি নেই, ফসলও নেই** — যেন আল্লাহ মানুষের হৃদয়কে তাদের প্রতি আকুল করে দেন এবং তাদের ফলমূলের রিযিক দেন। সেই উপত্যকাই আজ **পৃথিবীর বুকে মানুষ সবচেয়ে বেশি যেখানে যায়**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

উপত্যকাটি ছিল অনুর্বর পাহাড়ের মাঝে খালি মরুভূমি — নদী নেই, ঝরনা নেই, তখন কোনো বাণিজ্যপথও নেই। কাউকে সেদিকে টেনে আনার মতো কিছুই সেখানে ছিল না। আর দোয়াটির গড়নও অদ্ভুত: তিনি ফসল চাননি, জমির জন্য পানিও চাননি; চেয়েছেন আলাদা দুটি জিনিস — **ঝুঁকে পড়া হৃদয়**, আর **রিযিক হিসেবে ফলমূল**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আজকের মক্কা: কেবল হজের মৌসুমেই গোনা কয়েক দিনে সেখানে যান বিশ লাখেরও বেশি মানুষ, আর সারা বছর ধরে উমরাহ করেন লাখ লাখ। একশ আশি কোটিরও বেশি মানুষের মুখ সেদিকে ফেরে **প্রতিদিন পাঁচ বার**। অথচ তার মাটি বদলায়নি: আজও তা ফসলহীন উপত্যকা। তবু তার বাজারে আপনি পাবেন গোটা পৃথিবীর ফল, সারা বছর আসে প্রতিটি মহাদেশ থেকে। আর মরুভূমির বুকে জমজমের কূপ বয়ে চলেছে চার হাজার বছর ধরে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

মুজিযা রয়েছে **দোয়াটির গড়নের ভেতরেই**। মরুভূমিতে পরিবার রেখে আসা মানুষের স্বাভাবিক দোয়া হতো — জমি উর্বর হোক, বৃষ্টি নামুক। কিন্তু তিনি চাইলেন **মানুষের হৃদয় তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ুক** — অর্থাৎ রিযিক আসুক মানুষের হাত ধরে, মাটির হাত ধরে নয়। আর তিনি নিখুঁত ছিলেন: বললেন "**মানুষের মধ্য থেকে কিছু হৃদয়**", "সব মানুষ" নয় — সকলের জন্য চাইলে সে জায়গায় তাদের ঠাঁই হতো না। তারপর বললেন "**ঝুঁকে পড়ে**", "আসে" নয় — আরবি এই ক্রিয়াটির অর্থ আকুলতা ও টানে কোনো কিছুর দিকে ঝরে পড়া, বাধ্য হয়ে আসা নয়। প্রথমবার কাবা দেখা মানুষের অবস্থার এ এক হুবহু বর্ণনা। এই মাপের নিখুঁত এক দোয়া, তারপর চার হাজার বছর ধরে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে চলেছে।

55

পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

সুরাকার হাতে কিসরার দুই বালা

তিনি সুরাকা ইবনে মালিককে বললেন: তোমার কেমন লাগবে যখন তুমি কিসরার দুই বালা পরবে?

বর্ণনা করেছেন বাইহাকি, ইবনে আবদুল বার ও অন্যরা

হিজরতের দিন

নবী ﷺ ধাওয়ার মুখে আর মাথার দাম ধরা

“কেমন লাগবে যখন তুমি পরবে কিসরার দুই বালা?”

→

উমরের খিলাফত

কিসরার দুই বালা তার হাতে সব মানুষের সামনে

দুইয়ের মাঝে প্রায় 15 বছর... আর প্রাচ্যের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের পতন

একশো উটের লোভে যে লোকটি তাঁকে হত্যা করতে বেরিয়েছিল... তাকেই দেওয়া হলো কিসরার ধনভাণ্ডারের ওয়াদা

সহজ কথায়

হিজরতের দিন সুরাকা পুরস্কারের লোভে নবী ﷺ-এর পিছু ধাওয়া করে বেরিয়েছিল। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন: **তোমার কেমন লাগবে যখন তুমি পারস্যের বাদশাহর দুই বালা পরবে?** আর বছর কয়েক পর উমর ইবনুল খাত্তাবের খিলাফতকালে সে সত্যিই সেই দুটি পরেছিল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

যে মুহূর্তে এই কথা বলা হয়েছিল, তা **গোটা সিরাতের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্ত**: নবী ﷺ নিজের শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন, তাড়া খাওয়া অবস্থায়, তাঁর বাহন আর সঙ্গীটি ছাড়া কিছুই নেই, আর তাঁকে ধরিয়ে দিলে একশো উট পুরস্কার ঘোষিত। আর পারস্য তখন পৃথিবীর দুই মহাশক্তির একটি, আর তার বাদশাহ ব্যঙ্গ করে নবী ﷺ-এর চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উমর ইবনুল খাত্তাবের খিলাফতকালে সাসানি সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং মাদাইন বিজিত হয়, আর কিসরার ধনভাণ্ডার মদিনায় বয়ে আনা হয়। তখন উমর সুরাকা ইবনে মালিককে ডেকে পরিয়ে দিলেন **কিসরার দুই বালা, তার মুকুট ও তার কোমরবন্ধ**, আর তাকে বললেন: “বলো: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এগুলো হুরমুযপুত্র কিসরার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন আর পরিয়ে দিয়েছেন বনু মুদলিজের এক বেদুইন সুরাকা ইবনে মালিককে।” খবরটি হাদিস ও ইতিহাসের কিতাবে একাধিক সূত্রে বর্ণিত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনটি জিনিস একসঙ্গে জড়ো করেছে, যা অনুমানে কখনও মেলে না: **নাম ধরে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি** (সুরাকা), **নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত একটি বস্তু** (কিসরার দুই বালা, যেকোনো গনিমত নয়), আর **এক বিশাল রাজনৈতিক ঘটনা** (পারস্যের পতন ও তার ধনভাণ্ডার আরবদের হাতে পৌঁছানো)। আর কথাটি বলা হয়েছিল এমন একজনকে, যে তখন ছিল **পিছু ধাওয়া করা এক শত্রু**, সুসংবাদ পাওয়া সঙ্গী নয়। মন জয় করাই উদ্দেশ্য হলে অনেক ছোট প্রতিশ্রুতিই বেশি কাজে লাগত। কিন্তু তাড়া খাওয়া একজন মানুষ, যার সেদিন নিজে ছাড়া কিছুই ছিল না, সে তার ধাওয়াকারীকে পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডারের ওয়াদা দিচ্ছে — এ হলো এমন একজনের কথা, যিনি নিজের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত, আর সে উৎস মানুষের নয়।

সূত্র «الطبري – «تاريخُ الرُّسُلِ والمُلوك

56

পৃথিবীর আকৃতি

তিনি রাতকে দিনের উপর জড়িয়ে দেন

> তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর জড়িয়ে দেন এবং দিনকে রাতের উপর জড়িয়ে দেন।
>
> **সূরা আয-যুমার — আয়াত 5**

রাত আর দিন পৃথিবীর গোলককে ঘিরে জড়িয়ে চলে, এমন এক আবর্তনে যা কখনো থামে না

সহজ কথায়

এখানে ব্যবহৃত আরবি ক্রিয়াপদটি এসেছে গোলক বোঝানো শব্দ থেকে, আর পাগড়ি পেঁচানোর শব্দ থেকে — অর্থাৎ **গোল কোনো কিছুর উপর কোনো কিছু জড়িয়ে দেওয়া**। রাত পৃথিবীকে তেমনই জড়িয়ে ধরে, যেমন পাগড়ি মাথাকে জড়িয়ে ধরে। আর জড়ানো কেবল গোলাকার বস্তুর উপরেই হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সর্বত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল, পৃথিবী একটি বিছানো সমতল, আর রাত দিনের **জায়গা দখল করে নেয়** এবং তাকে মুছে দেয়। গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা পৃথিবীকে গোল বলেছিলেন, তাঁরাও এই কথাকে রাত ও দিনের সীমারেখার কোনো অবিরাম জড়ানো-গতির সঙ্গে যুক্ত করেননি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পৃথিবী একটি গোলক (দুই মেরুতে সামান্য চাপা), আর সূর্য সব সময় তার অর্ধেককে আলোকিত করে। নিজের অক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণন **রাত ও দিনের বিভাজন-রেখাটিকে** তার পৃষ্ঠের উপর দিয়ে অবিরাম সরিয়ে নিয়ে চলে — অর্থাৎ রাত আক্ষরিক অর্থেই গোলকটিকে জড়িয়ে ধরে, মুছে যায় না, সরে যায়। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা পৃথিবীর যেকোনো সরাসরি ছবিতে আপনি নিজের চোখেই তা দেখতে পাবেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

রাত ও দিনের পালাবদল বোঝাতে গোলকের ধাতু থেকে গড়া একটি ক্রিয়াপদ বেছে নেওয়া সমতল পৃষ্ঠের উপর কোনো অর্থই রাখে না। আরও সূক্ষ্ম বিষয় হলো, আয়াতটি এই জড়ানোকে **দুই দিকেই পরস্পরমুখী** করে দেয় — "তিনি রাতকে দিনের উপর জড়িয়ে দেন এবং দিনকে রাতের উপর জড়িয়ে দেন" — আর এমন বর্ণনা কেবল সে-ই দিতে পারে, যে গোলাকার বস্তুর উপর একটি অবিরাম আবর্তন দেখছে। আর অন্যত্র এসেছে: "এরপর তিনি **পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন**" — আরবি এই ক্রিয়ার অর্থ বিছানো, প্রসারিত করা ও সমান করা, অর্থাৎ পৃষ্ঠকে বসবাসের উপযোগী করে তোলা। আর গোলাকৃতির প্রমাণের মূল ভিত্তি *তাকভীর*-এ, *দাহা*-য় নয়; কারণ দুটির মধ্যে কেবল প্রথমটিই গোলকের ধাতু থেকে এসেছে।

সূত্র NASA Earth Observatory – the day-night terminator

পানিচক্র

৫৭ যে আকাশ ফিরিয়ে দেয়

শপথ সেই আকাশের, যা ফিরিয়ে দেয়।

সূরা আত-তারিক — আয়াত 11

পানি বাষ্প হয়ে ওঠে আর বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসে — বদ্ধ এক চক্র, যাতে কিছুই হারায় না

সহজ কথায়

আকাশ সমুদ্র থেকে পানি নেয় বাষ্প হিসেবে, তারপর তা বৃষ্টি বানিয়ে আমাদের **ফিরিয়ে দেয়**। আজ আপনি যে ফোঁটাটি পান করছেন, আপনার আগে সেটি কেউ পান করেছে, আর আপনার পরেও কেউ পান করবে। পানি ফুরায় না, ফিরে আসে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বৃষ্টিকে মনে করা হতো **নতুন** পানি, যা আল্লাহ আকাশের ভাণ্ডার থেকে নামিয়ে দেন — পৃথিবী থেকেই ফিরে আসা পানি নয়। অ্যারিস্টটল বাষ্পের উপরে ওঠা আর বৃষ্টি হয়ে ফেরার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তা মাপজোখহীন তত্ত্বই থেকে যায়; পানিচক্র যে বদ্ধ এক ব্যবস্থা, যেখানে বৃষ্টিই নদীর স্রোতের হিসাব মেটায় — তা প্রমাণিত হয় সতেরো শতকে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পানিচক্র: জলাশয় থেকে বাষ্পীভবন → মেঘে ঘনীভবন → বর্ষণ → প্রবাহ → আবার বাষ্পীভবন। পৃথিবীতে পানির পরিমাণ **শত কোটি বছর ধরে অপরিবর্তিত**, কেবল ঘুরে ফেরে, বাড়েও না কমেও না। আর বায়ুমণ্ডল শুধু পানিই ফেরায় না, তাপ আর বেতার তরঙ্গও ফিরিয়ে দেয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটিমাত্র শব্দ — "**ফিরিয়ে দেওয়া**" — গোটা অর্থটাই বহন করছে। আরবিতে এর মানে **কোনো জিনিসের নিজের জায়গায় ফিরে আসা**, নিছক নেমে আসা নয়। আকাশকে এই গুণে ডাকার অর্থই হলো এ কথা বলা যে, তা থেকে যা নামে তা আগে তার দিকেই উঠেছিল। দুটি শব্দে এ-ই গোটা পানিচক্রের সারাংশ। অন্য জায়গায় তা নিশ্চিত করা হয়েছে: "আর আমি আকাশ থেকে **নির্ধারিত পরিমাণে** পানি নামিয়েছি" — স্থির, মাপা এক পরিমাণ, যা বদলায় না।

সূত্র U.S. Geological Survey — *The Water Cycle* · The ionosphere and the reflection of radio waves

58

পানিচক্র

পরিমিত পানি — না বাড়ে, না কমে

আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি নামিয়েছি, অতঃপর তা পৃথিবীতে থিতু করেছি। আর নিশ্চয়ই আমি তা নিয়ে যেতেও সক্ষম।

সূরা আল-মুমিনুন — আয়াত 18

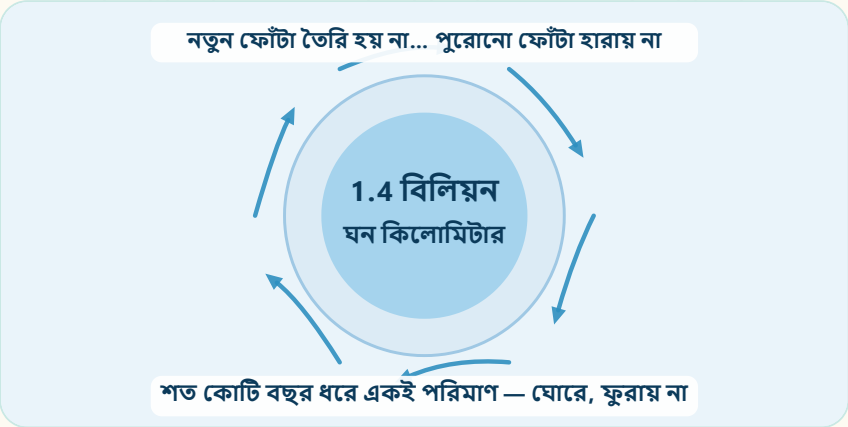

গোটা গ্রহজুড়ে পানির এক স্থির ভারসাম্য

সহজ কথায়

পৃথিবীতে পানির পরিমাণ **স্থির: না বাড়ে, না কমে**। ডাইনোসর যে পানি পান করেছিল, আজ আপনি সেই একই পানি পান করছেন। আর আয়াতের "**পরিমিতভাবে**" কথাটির অর্থ: হিসাব করা, নির্দিষ্ট পরিমাণে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বৃষ্টিকে বোঝা হতো এভাবে — মানুষের প্রয়োজন হলেই আকাশের ভাণ্ডার থেকে নতুন পানি নামিয়ে দেওয়া হয়। **একটি আবদ্ধ, স্থির পরিমাণ চক্রাকারে ঘুরছে** — এমন ধারণা কোনো সংস্কৃতিতেই ছিল না। সহজ ধারণাই তো এই যে বাষ্পীভবনে সাগরের পানি কমে যায় আর বৃষ্টি নতুন সংযোজন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পৃথিবীতে পানির আয়তন প্রায় **1.4 বিলিয়ন ঘন কিলোমিটার** বলে হিসাব করা হয়, এবং কোটি কোটি বছর ধরে তা মোটামুটি স্থির। তা বাষ্প হয়, ঘনীভূত হয়, ঝরে পড়ে, বয়ে যায় এবং ফিরে আসে — এমন এক আবদ্ধ চক্রে, যা কিছু যোগও করে না, কিছু বাদও দেয় না। বায়ুমণ্ডল ও চৌম্বকক্ষেত্র মিলে জলীয় বাষ্পকে মহাশূন্যে পালাতে দেয় না — মঙ্গলে ঠিক এটিই ঘটেনি, তাই তার অধিকাংশ পানি বাষ্প হয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে, পড়ে আছে এক মৃত মরুভূমি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"**পরিমিতভাবে**" শর্তটিই এখানে বিস্ময়, আর পরিমাণ স্থির না হলে এর কোনো অর্থই দাঁড়ায় না। পানি যদি প্রতিবার নামার সময় নতুন করে সৃষ্টি হতো, তবে তা মেপে দেওয়ার কোনো মানে থাকত না। তার চেয়েও সূক্ষ্ম এর পরের কথাটি: "**অতঃপর তা পৃথিবীতে থিতু করেছি**" — থিতু করা মানে টিকে থাকা ও জমা থাকা, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়; পানি পৃথিবীতে সঞ্চিত, পৃথিবীর দ্বারা নিঃশেষিত নয়। তারপর শেষ সতর্কবাণী: "**আর নিশ্চয়ই আমি তা নিয়ে যেতেও সক্ষম**" — অর্থাৎ এই ভারসাম্য এমন এক অনুগ্রহ, যা তুলে নেওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানীরা আজ মঙ্গলে ঠিক তা-ই ঘটতে দেখেন: সেই গ্রহ তার আশি শতাংশেরও বেশি পানি হারিয়েছে, অবশিষ্ট আছে কেবল দুই মেরুর বরফ আর পৃষ্ঠের নিচে যা আছে তা।

সূত্র U.S. Geological Survey – how much water is there on Earth?

পৃথিবীর আকৃতি

৫৯ আর পৃথিবীকে — এরপর তিনি বিছিয়ে দিলেন

আর এরপর তিনি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি।

সূরা আন-নাযিআত — আয়াত 30-31

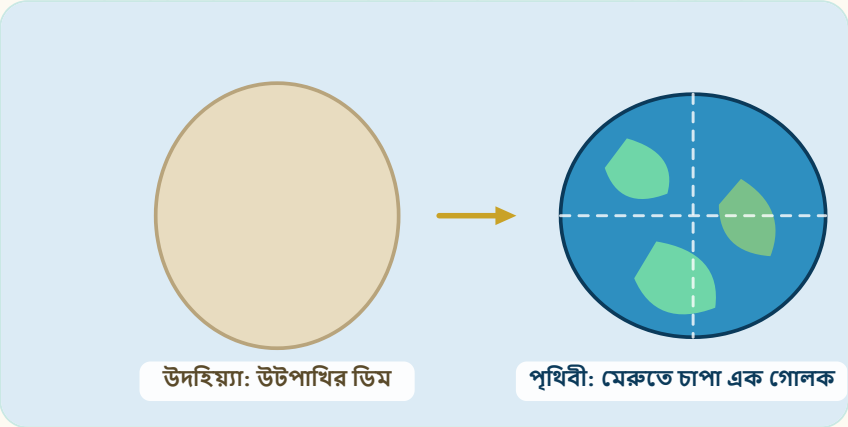

পৃথিবী নিখুঁত কোনো গোলক নয়, বরং মেরুতে চাপা আর বিষুবরেখায় স্ফীত

সহজ কথায়

আরবি ক্রিয়া *দাহা*-র অর্থ: **বিছানো, প্রশস্ত করা ও সমতল করা**। এ থেকেই এসেছে *উদহিয়্যা* — উটপাখির ডিম পাড়ার জায়গা, কারণ সে পা দিয়ে তা *দাহা* করে, অর্থাৎ বিছিয়ে দেয়। তাই পৃথিবী বিছানো, যাতে আপনি তার উপরে হাঁটেন ও বসবাস করেন — আর তার গোলাকৃতির কথা, সেটির জায়গা **"ইউকাওউইরু"**, "দাহা" নয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সাধারণ মানুষের ধারণায় পৃথিবী ছিল একটি সমতল পৃষ্ঠ, এর বেশি কিছু নয়। আর দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা একে গোল বলতেন, তাঁরা বলতেন **নিখুঁত গোলক**। মেরুতে চাপা হওয়ার কথা কেউই বলেননি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পৃথিবী একটি **চাপা গোলক** (Oblate Spheroid): বিষুবরেখায় তার ব্যাস মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত ব্যাসের চেয়ে প্রায় 43 কিলোমিটার বেশি, কারণ সে নিজের চারপাশে ঘোরে। নিউটন 1687 সালে এটি তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেন, আর ফরাসি অভিযানগুলো 1736 সালে মাঠে গিয়ে তা মেপে দেখে। জিওইড নামের নিখুঁত আকৃতিটি এই চাপা গোলক থেকে দুইশো মিটারের কমই সরে যায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ভাষাই এখানে বিষয়টি চুকিয়ে দেয়। আরবি অভিধানে *দাহা*-র অর্থ বিছিয়ে দেওয়া ও প্রশস্ত করা, আর একই ধাতু থেকে এসেছে উটপাখির বাসা ও তার ডিমের শব্দ দুটি। ধাতুটিতে গোলাকৃতি নেই: **উদহিয়্যা নামটি এসেছে বিছানো থেকে, ডিমের আকৃতি থেকে নয়** — উটপাখি পা দিয়ে নিজের জায়গাটি দাহা করে, অর্থাৎ সমান করে বিছিয়ে দেয়। গোলাকৃতির জায়গা অন্য একটি ক্রিয়া, যা গোলকের নিজস্ব ধাতু থেকেই: "তিনি রাতকে দিনের উপরে জড়িয়ে দেন"। আর এখানে "বিছানো" ও "প্রসারিত করা" বোঝানো সাধারণ ক্রিয়ার বদলে *দাহা* বেছে নেওয়া হয়েছে সমতল করা ও প্রস্তুত করার জন্য, আকৃতির জন্য নয়। আর চাবিকাঠি হলো, পরের আয়াতটিই বলে দিয়েছে বিছানোটা কীসের জন্য: "তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি" — অর্থাৎ বসবাসের প্রস্তুতি, সমতল করে দেওয়া নয়।

সূত্র Newton – *Principia*, 1687 · French Geodesic Mission to Lapland, 1736-1737

60

আধুনিক চিকিৎসা

মধুতে মানুষের জন্য আরোগ্য

তাদের পেট থেকে বের হয় বিভিন্ন রঙের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে।

সূরা আন-নাহল — আয়াত 69

কাঁচা মধু

চিকিৎসা যা প্রমাণ করেছে

- ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে
- ক্ষত ও পোড়ার চিকিৎসা করে
- শিশুদের কাশি প্রশমিত করে
- অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহনাশক
- আজ হাসপাতালে ব্যবহার হয়

চিকিৎসা-মধুর ব্যান্ডেজ ইউরোপ ও আমেরিকায় সরকারিভাবে অনুমোদিত

চিকিৎসা-মধুর ব্যান্ডেজ আজ ফার্মেসিতে সরকারি অনুমোদন নিয়ে বিক্রি হয়

সহজ কথায়

চৌদ্দশ বছর আগে কুরআন বলেছে, মধুতে **আরোগ্য** আছে। আর আজ হাসপাতালে মধু ব্যবহার করা হয় সেসব ক্ষত ও পোড়া সারাতে, যেগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যর্থ হয়েছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মধু ছিল মিষ্টি ও মূল্যবান খাদ্য, আর লোকায়ত অভিজ্ঞতা তাকে নানা উপকারের কৃতিত্ব দিত। কিন্তু ঐশী ঘোষণার ভঙ্গিতে এ কথা বলা যে তাতে **আরোগ্য** আছে — সেটি আলাদা ব্যাপার; বিশেষত যখন তা বেরোয় একটি পোকার পেট থেকে, যেখান থেকে বুদ্ধি কোনো উপকার আশাই করে না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মধু তিনটি কৌশলে প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক: তার চিনির ঘনত্ব ব্যাকটেরিয়া থেকে পানি টেনে নিয়ে তাদের মেরে ফেলে; তার অম্লতা তাদের বাড়তে দেয় না; আর তার ভিতরের এনজাইম গ্লুকোজ অক্সিডেজ ধীরে ও অবিরামভাবে **হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড** তৈরি করে। সরকারি ওষুধ-সংস্থাগুলো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের জন্য ম্যানুকা মধুর ব্যান্ডেজ অনুমোদন করেছে, আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশুদের কাশি উপশমে মধুর সুপারিশ করে। ফেরাউনি সমাধিতে পাওয়া মধু তিন হাজার বছর পরেও খাওয়ার উপযুক্ত ছিল।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সূক্ষ্মতার দুটি জায়গা লোকায়ত অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রথম: "বিভিন্ন **রঙের**" — আজ এটি জানা সত্য যে মধুর রং আর তার ঔষধি গুণ উদ্ভিদ-উৎস অনুযায়ী বদলায়, আর সে কারণেই তার নিরাময়ী ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হয়। দ্বিতীয়: "তাদের **পেট** থেকে বের হয়" — মধু আসলে তৈরি হয় **মধু-পাকস্থলীতে**, যা হজমের পাকস্থলী থেকে আলাদা একটি ভিতরের থলি; সেখানেই এনজাইম যুক্ত হয়, তারপর তা উদ্গিরণ করা হয়। বাণীটি সঠিক শারীরস্থানগত উৎসকে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেছে।

সূত্র Cochrane Review – honey as a topical treatment for wounds · Cochrane Review – honey for acute cough in children

61

সূর্যের গতি

সূর্য ছুটে চলেছে... স্থির নয়

আর সূর্য চলছে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।

সূরা ইয়াসীন — আয়াত 38

সূর্য তার সব গ্রহকে সঙ্গে টেনে নিয়ে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে সাঁতরে চলে

সহজ কথায়

সূর্য নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তা প্রচণ্ড গতিতে **ছুটে চলেছে**, আর সঙ্গে টেনে নিচ্ছে পৃথিবী ও সব গ্রহকে — আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘিরে এক দীর্ঘ যাত্রায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষ সূর্যকে উঠতে ও অস্ত যেতে দেখত, তাই ভাবত এর গতি মানে কেবল পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরা। এরপর এল আধুনিক যুগ, যা বলল: না, ঘোরে বরং পৃথিবীই, আর **সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে স্থির**। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক জুড়ে এটিই ছিল প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সূর্য প্রকৃতই তিনটি প্রমাণিত গতিতে চলছে: প্রায় প্রতি 25 দিনে একবার নিজ অক্ষে ঘোরে; আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘিরে ছুটছে সেকেন্ডে প্রায় **220 কিলোমিটার** বেগে, প্রতি 225 মিলিয়ন বছরে একটি পূর্ণ চক্কর দিয়ে; আর আকাশের একটি বিন্দুর দিকেও এগিয়ে চলেছে, যাকে বলা হয় সৌর অ্যাপেক্স।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন বৈপরীত্যটি: আয়াতটি নাজিল হয়েছিল তখন, যখন মানুষ ভাবত সূর্য তাদের চারদিকে ঘোরে — আর আয়াত সূর্যের জন্য সাব্যস্ত করল ছুটে চলা। এরপর এল এমন এক যুগ, যা সূর্যের সব গতি অস্বীকার করে বলল "তা স্থির"; তখন আয়াতটিকে বিজ্ঞানবিরোধী মনে হলো। তারপর আরও নতুন বিজ্ঞান এসে প্রমাণ করল এমন বাস্তব ছুটে চলা, যা **কারও কল্পনার চেয়েও বিশাল**। একটিমাত্র বাক্য বিজ্ঞানের দুটি পূর্ণ উল্টো-মোড়ের সামনে অটল থাকল — এটুকুই তো দলিল।

সূত্র Binney & Tremaine – *Galactic Dynamics* · *Britannica* – "Milky Way Galaxy"

বায়ুমণ্ডল

62

এক ছাদ আপনাকে বাঁচায়, অথচ আপনি তা দেখেন না

> আর আমি আকাশকে বানিয়েছি সুরক্ষিত ছাদ; অথচ তারা তার নিদর্শন থেকে বিমুখ।
>
> সূরা আল-আম্বিয়া — আয়াত 32

আপনি ঘরে ঘুমিয়ে থাকেন, আর প্রতিদিন হাজারো উল্কা আপনার কাছে পৌঁছানোর আগেই পুড়ে যায়

সহজ কথায়

আপনার মাথার উপরে এমন এক ছাদ আছে, যা আপনি দেখেন না, অথচ তা আপনাকে রক্ষা করে। আমাদের দিকে ছুটে আসা উল্কা পৌঁছানোর আগেই তাতে পুড়ে যায়, আর প্রাণঘাতী রশ্মি তা আটকে দেয়। **এটি না থাকলে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী মারা যেত**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের কাছে "আকাশ" ছিল হয় ফাঁকা শূন্য, নয়তো একটি শক্ত গম্বুজ, যাতে তারাগুলো গাঁথা। আমাদের উপরে যে **অদৃশ্য একটি স্তর রক্ষার কাজ করে যাচ্ছে**, তা কারও মাথায়ই আসেনি। জ্বলন্ত উল্কাকে তারা ভাবত খসে পড়া তারা, ঢালে পুড়ে যাওয়া উল্কাপিণ্ড নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বায়ুমণ্ডল প্রতিদিন আনুমানিক একশ টন মহাজাগতিক বস্তু পৌঁছানোর আগেই পুড়িয়ে দেয়। ওজোন স্তর প্রাণঘাতী অতিবেগুনি রশ্মির প্রায় 99% শুষে নেয়। আর পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র ঠেকিয়ে দেয় **সৌরবায়ু**, যা নইলে পৃথিবীকে তার বাতাস ও পানি থেকে বঞ্চিত করে ছাড়ত — ঠিক যেমনটা মঙ্গলের বেলায় হয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"ছাদ" আর "সুরক্ষিত" — এই দুই শব্দের একত্র হওয়াই অলৌকিক। ছাদ বোঝায় সর্বব্যাপী আচ্ছাদন, আর আরবি কর্মবাচক বিশেষণটি বোঝায় যে তা **নিজে সুরক্ষিত এবং নিচের সবকিছুকে সুরক্ষা দেয়**। এরপর এল পরের বাক্যটি: "অথচ তারা তার নিদর্শন থেকে বিমুখ" — অর্থাৎ এই ছাদে এমন **নিদর্শন** আছে, যেগুলো থেকে মানুষ উদাসীন থাকবে। এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত যে এর ভেতরে এমন বিস্ময় আছে, যা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। হয়েছেও তাই: ওজোন **স্তর** আবিষ্কৃত হয়নি 1913 সালের আগে, আর সৌরবায়ু ঠেকাতে চৌম্বকক্ষেত্রের ভূমিকা জানা যায়নি 1958 সালে ভ্যান অ্যালেন বলয় আবিষ্কারের আগে।

সূত্র Fabry & Buisson (1913) – the ozone layer · Van Allen (1958) – the radiation belts

63

উল্কা

যে উল্কারা আকাশ পাহারা দেয়

আর নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সাজিয়েছি, আর সেগুলোকে করেছি শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু।

সূরা আল-মুলক — আয়াত 5

বুলেটের চেয়েও দ্রুত গতিতে বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় উল্কা জ্বলে ওঠে

সহজ কথায়

আয়াতটি নক্ষত্র আর আলোকোজ্জ্বল বস্তুগুলোকে একসঙ্গে দুটি কাজ দেয়: **আকাশের সৌন্দর্য**, আর **উপরে উঠে আসার চেষ্টা করলে যা ছুড়ে মেরে তাড়িয়ে দেয়**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবদের চোখে উল্কা ছিল "খসে পড়া তারা", আর অন্য সংস্কৃতিতে কোনো রাজার মৃত্যু বা কোনো বড় ঘটনার লক্ষণ। এগুলো যে **কঠিন বস্তু, ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে** — তা জানা ছিল না। বরং প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অস্বীকার করে এসেছে যে আকাশ থেকে পাথর পড়তে পারে, আর ফরাসি অ্যাকাডেমি এমন দাবিদারদের উপহাস করেছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উল্কাপিণ্ড হলো পাথুরে ও ধাতব বস্তু, যা সেকেন্ডে কয়েক দশ কিলোমিটার গতিতে বায়ুমণ্ডলে ঢোকে, আর বাতাসের চাপ ও তাপে তাদের অধিকাংশই পুরোপুরি পুড়ে যায়। প্রতিদিন ঢোকা ভরের পরিমাণ আনুমানিক **একশো টন**। 1803 সালে ফ্রান্সের লেগল ঘটনার পর উল্কাপাত বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি আকাশের বস্তুগুলোর দুটি ভিন্ন কাজ আলাদা করেছে: স্থির সৌন্দর্য, আর **চলমান নিক্ষেপ**। আরবিতে যে শব্দটি এসেছে তার অর্থ নির্দিষ্টভাবে পাথর ছুড়ে মারা — আলো দিয়ে নয়, আগুন দিয়েও নয়। আকাশ থেকে জ্বলতে জ্বলতে নেমে আসা জিনিসকে নিক্ষিপ্ত পাথর বলা, আর তাও এমন এক সময়ে, যখন প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান এরও শতাব্দী পরে পর্যন্ত অস্বীকার করত যে আকাশে আদৌ পাথর আছে — এমন বর্ণনা কাকতালীয় হতে পারে না।

সূত্র Biot (1803) – the L'Aigle meteorite fall

প্রত্নতত্ত্ব

৬৪ যুলকারনাইনের প্রাচীর — লোহা আর গলিত তামা

আমার কাছে লোহার পাত আনো — অবশেষে যখন সে দুই পাহাড়ের মাঝের ফাঁক সমান করে দিল, তখন বলল: হাপরে ফুঁ দাও। অবশেষে যখন সে তাকে আগুন বানিয়ে ফেলল, তখন বলল: আমার কাছে গলিত তামা আনো, আমি তার উপর ঢেলে দিই।

সূরা আল-কাহফ — আয়াত 96

লোহার উপর গলিত তামা ঢালা ফাঁকগুলো ভরে দেয় আর মরিচা ঠেকায়

সহজ কথায়

যুলকারনাইন দুই পাহাড়ের মাঝে একটি দেয়াল গড়লেন: **লোহার টুকরোগুলো** ঠেসে সাজালেন, তারপর আগুন জ্বালালেন যতক্ষণ না সেগুলো লাল হয়ে উঠল, তারপর তার উপর ঢাললেন **গলিত তামা**। এটিই হুবহু সেই পদ্ধতি, যা দিয়ে মরিচা-না-ধরা অত্যন্ত শক্ত সংকর ধাতু তৈরি হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ধাতু সম্পর্কে জ্ঞান ছিল সহজ-সরল: লোহা গরম থাকতেই পেটানো হয়, আর তামা ঢালা হয় ছাঁচে। **দুটি ধাতুকে গলিয়ে এক কাঠামোয় মিশিয়ে দেওয়ার** ভাবনাটি নির্মাণকৌশল হিসেবে জানা ছিল না, আর একটিকে উত্তপ্ত অবস্থায় অন্যটির উপর কেন ঢালতে হবে, তাও জানা ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উত্তপ্ত লোহার উপর গলিত তামা ঢাললে যা তৈরি হয় তা **তামা দিয়ে ঝালাই বা ব্রেজিংয়ের** মতো: তরল তামা কৈশিক ক্রিয়ায় টুকরোগুলোর ফাঁকে ঢুকে পড়ে, সেগুলোকে শক্ত করে বাঁধে আর বাতাস বের করে দেয়। ফলাফল একটি নিরেট, অখণ্ড পিণ্ড, যাতে কোনো ফাঁপা জায়গা নেই। তামার আবরণ আবার **লোহাকে বাতাস ও আর্দ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে, আর তাই মরিচা ঠেকায়** — এটিই আজ ব্যবহৃত ধাতব প্রলেপের মূলনীতি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ধাপগুলোর ক্রমই এখানে বিস্ময়, আর এটি এমন এক প্রকৌশলগত ক্রম যার বদলে অন্য কিছু চলে না: 1) **লোহার পাত** — আরবি শব্দটির অর্থ বড় খণ্ড, অর্থাৎ ভার বহনকারী কাঠামোটি লোহার। 2) **ফুঁ দাও** — অর্থাৎ তাপ বাড়াতে বাতাস জোগানো, ঢালাইখানায় হাপর ঠিক এ কাজটিই করে। 3) **অবশেষে যখন সে তাকে আগুন বানিয়ে ফেলল** — অর্থাৎ লোহা সেই লাল তাপমাত্রায় পৌঁছাল, যেখানে তা জোড়া লাগা মেনে নেয়। 4) **তারপর তার উপর গলিত তামা ঢালা**। ঠান্ডা লোহার উপর তামা ঢালা হলে কোনো বন্ধনই তৈরি হতো না। বাণীটি ঢালার আগের তাপের শর্তটিই বর্ণনা করছে — আর সেটিই গোটা প্রক্রিয়ার প্রাণ।

সূত্র ASM Handbook 6 – *Welding, Brazing, and Soldering*

65

কক্ষপথ

সূর্য চাঁদকে ধরতে পারে না

সূর্যের জন্য সংগত নয় যে সে চাঁদকে গিয়ে ধরবে, আর রাতও দিনকে অতিক্রম করে যায় না; প্রত্যেকেই এক কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।

সূরা ইয়াসিন — আয়াত 40

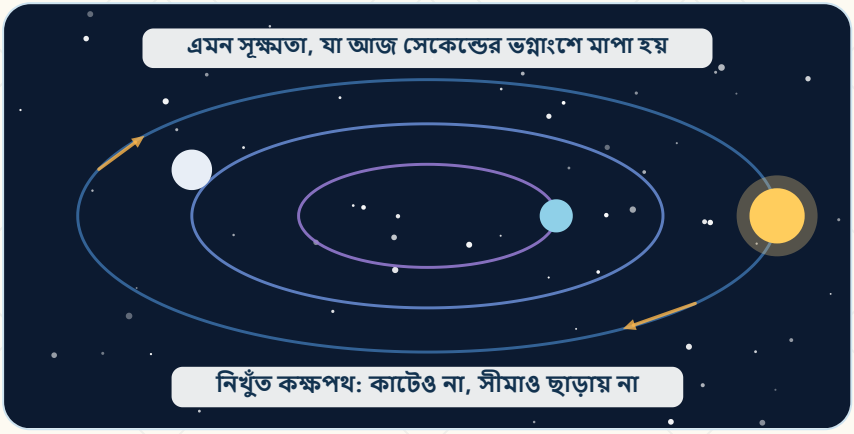

প্রতিটি জ্যোতিষ্ক নিজের পথে স্থির, পথ ছাড়ে না, অন্যকেও ধরে না

সহজ কথায়

মহাকাশের জ্যোতিষ্কগুলো চলে বিপুল গতিতে, তবু **একটি আরেকটির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় না**; রাত দিনকে না পেরিয়ে যায়, না পিছিয়ে পড়ে। এমন এক ব্যবস্থা, যা চোখের পলকের জন্যও এলোমেলো হয় না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জ্যোতিষ্কগুলোর গতি, তাদের কক্ষপথ কিংবা তাদের চলার নিয়ম — কোনো কিছুরই জ্ঞান ছিল না। গ্রহণকে ব্যাখ্যা করা হতো ক্রোধ বা সতর্কবার্তা বলে, **শত শত বছর আগে হিসাব করে বের করা যায় এমন নির্ধারিত সময়** বলে নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

জ্যোতিষ্কগুলোর কক্ষপথ এমন সূক্ষ্মতায় নিয়ন্ত্রিত যে জ্যোতির্বিদেরা বিস্মিত হন। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে নিজের কক্ষপথ পাড়ি দেয় সেকেন্ডে 30 কিলোমিটার বেগে, চাঁদ ঘোরে পৃথিবীকে ঘিরে — আর কোনো সংঘর্ষ ঘটে না। ব্যবস্থার নিখুঁততা এমন যে **এই শতকের গ্রহণগুলো সেকেন্ডের হিসাবে গণনা করা যায়**, আর হাজার বছর পরের গ্রহণ কয়েক দশ মিনিটের হিসাবে — এই পার্থক্যের কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির পরিবর্তন, কক্ষপথের কোনো শিথিলতা নয়। এই নিয়মনিষ্ঠার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে গোটা মহাকাশ-নৌচালনা: আজ ছোড়া একটি যান সাত বছর পরে আগে থেকেই হিসাব করা এক বিন্দুতে গিয়ে গ্রহের সঙ্গে মিলিত হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"**সংগত নয়**" কথাটিই নিখুঁততার জায়গা। এটি কেবল ঘটনাটি ঘটে না তা বলছে না, বরং **সম্ভাবনাকেই** অস্বীকার করছে — অর্থাৎ ব্যবস্থাটি নিজেই তা ঘটতে দেয় না; কাকতালীয়ভাবে ঘটেনি, ব্যাপারটি এমন নয়। আর এটিই তো **ভৌত সূত্রের** সংজ্ঞা। এরপর সূক্ষ্মতাটি লক্ষ করুন: অস্বীকার করা হলো সূর্যের চাঁদকে ধরা — অথচ এরা দুটি ভিন্ন কক্ষপথে; আর অস্বীকার করা হলো রাতের দিনকে অতিক্রম করা — অথচ এ দুটিই পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফল। কারণে ভিন্ন দুটি ঘটনাকে একটিই নিয়মের নিচে জড়ো করা হলো: "**প্রত্যেকেই এক কক্ষপথে সাঁতার কাটছে**" — দুই ক্ষেত্রেই কারণ একটিই: প্রতিটি জ্যোতিষ্ক নিজের কক্ষপথে বাঁধা।

সূত্র Newton – *Principia*, 1687 (orbital mechanics)

66

সূক্ষ্ম সমন্বয়

দয়াময়ের সৃষ্টিতে আপনি কোনো অসংগতি দেখবেন না

তিনিই সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম দয়াময়ের সৃষ্টিতে আপনি কোনো অসংগতি দেখবেন না। আপনি আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন — কোনো ফাটল কি চোখে পড়ে?

সূরা আল-মুলক — আয়াত ৩

- মাধ্যাকর্ষণ বল: একটু বাড়লেই বিশ্বজগৎ পিষে যেত
- নিউক্লিয় বল: একটু কমলে একটি মৌলও তৈরি হতো না
- বিশ্বজগতের আদি ঘনত্ব: কল্পনার অতীত এক সমন্বয়
- কৃষ্ণশক্তির ধ্রুবক: পদার্থবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম সংখ্যা

"আবার তাকান — কোনো ফাটল দেখতে পান?"

মহাবিশ্বের ধ্রুবকগুলো এমন সীমায় বাঁধা, যা সামান্যতম বিচ্যুতিও সয় না

সহজ কথায়

আয়াতটি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে — মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে তাতে **কোনো ত্রুটি, ফাটল বা ঘাটতি** খুঁজে বের করুন। তারপর আবার বলছে: দ্বিতীয়বার তাকান। আর বিজ্ঞান আজ বলে, মহাবিশ্বের ধ্রুবকগুলো এমন নিখুঁতভাবে বাঁধা যা মন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মহাবিশ্বকে দেখা হতো সাধারণ সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে। "ভৌত ধ্রুবক" বলে কোনো ধারণাই ছিল না, ছিল না এ ধারণাও যে মহাবিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো সংখ্যার উপর, যার একটিও সামান্য বদলে গেলে সবকিছু ভেঙে পড়বে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান একে বলে **সূক্ষ্ম সমন্বয়** (Fine-Tuning)। মাধ্যাকর্ষণের বল যদি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেও ভিন্ন হতো, নক্ষত্র কখনো তৈরি হতো না, কিংবা মহাবিশ্ব তৎক্ষণাৎ চুপসে যেত; সবল নিউক্লিয় বল সামান্য ভিন্ন হলে কার্বনও থাকত না, অক্সিজেনও নয়; আর কৃষ্ণশক্তির ধ্রুবককে বলা হয় **সমগ্র পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্যপ্রাপ্ত সংখ্যা**। বড় বড় পদার্থবিজ্ঞানীরা এ কথা স্বীকার করেছেন — যেমন ফ্রেড হয়েল, যিনি বলেছিলেন, তিনি যা দেখছেন তা যেন "কোনো অতিমেধা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে খেলা করেছে"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি নিছক ঘোষণা নয়, বরং **পরীক্ষা করার এবং বারবার পরীক্ষা করার স্পষ্ট আহ্বান**: "আপনি দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন", তারপর "আরও দুইবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন"। অর্থাৎ এটি বাজি ধরছে যে নিবিড়তর যাচাই **একে খণ্ডন করবে না, বরং আরও দৃঢ় করবে**। আক্ষরিক অর্থেই তা-ই ঘটেছে: পর্যবেক্ষণযন্ত্র যত সূক্ষ্ম হয়েছে, সমন্বয় তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরবি শব্দ "**ফুতুর**" মানে ফাটল ও চিড়, আর "**তাফাউত**" মানে বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য। সুতরাং আয়াতটি মহাবিশ্ব থেকে দুটি বৈশিষ্ট্য নাকচ করছে: অনুপাতের ত্রুটি আর কাঠামোর ফাটল — আর একজন পদার্থবিজ্ঞানী কোনো মহাজাগতিক মডেল যাচাই করার সময় ঠিক এ দুটোই খোঁজেন।

সূত্র Martin Rees – *Just Six Numbers*, 1999 · Weinberg (1989) – the cosmological constant problem

67 নক্ষত্রের অবস্থানের শপথ — নক্ষত্রের নয়

> অতএব আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অবস্থানসমূহের — আর নিশ্চয় এটি এক মহান শপথ, যদি আপনারা জানতেন।
>
> সূরা আল-ওয়াকিয়া — আয়াত 75-76

নক্ষত্রের আলো বহু বছর ধরে পথ চলে, তাই আপনি দেখছেন তার পুরোনো অবস্থান, এখন সে যেখানে আছে তা নয়

সহজ কথায়

রাতের আকাশে কোনো নক্ষত্রের দিকে তাকালে আপনি আসলে নক্ষত্রটিকে দেখছেন না! আপনি দেখছেন **বহু বছর আগে তার থেকে বেরিয়ে আসা আলো**, হয়তো হাজার হাজার বছর আগের। হতে পারে নক্ষত্রটি নিজেই নিভে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে, অথচ আপনি এখনো তাকে দেখছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

অ্যারিস্টটল ও তাঁর অনুসারীদের কাছে আলো কোনো সময় না নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবেই প্রকাশ পেত; এম্পিডোক্লিসের মতো গুটিকয় ছাড়া কেউ দ্বিমত করেননি, তাও কোনো প্রমাণ ছাড়া। নক্ষত্র বলতে যা আপনি দেখছেন তা-ই, ঠিক যেখানে দেখছেন সেখানেই — ব্যস, এইটুকুই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আলোর গতি সেকেন্ডে প্রায় 300,000 কিলোমিটার — দ্রুত বটে, কিন্তু **সীমিত**। সূর্যের পর আমাদের নিকটতম নক্ষত্রটি 4.2 আলোকবর্ষ দূরে, আর খালি চোখে আমরা যা দেখি তার কিছু কিছু হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে। তাই আজ রাতে আপনি যে আকাশ দেখছেন তা **পুরোনো ছবির একটি অ্যালবাম**, যার প্রতিটি নক্ষত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। এমন নক্ষত্রও সত্যিই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটেছে শতাব্দী আগে, অথচ তাদের আলো এখনো আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

শপথ করা হয়েছে নক্ষত্রগুলোর নয়, বরং **তাদের অবস্থানের** — এমন সুনির্দিষ্ট করার কোনো কারণই থাকে না, যদি না নক্ষত্র আর তার অবস্থানের মধ্যে সত্যিকারের কোনো পার্থক্য থাকে। এরপর পরের আয়াতটি স্পষ্ট করেই বলে দেয়: "আর নিশ্চয় এটি এক মহান শপথ, **যদি আপনারা জানতেন**" — অর্থাৎ এই শপথের মহত্ত্ব নির্ভর করছে এমন এক জ্ঞানের উপর, যা শ্রোতাদের কাছে ছিল না। একটি বক্তব্য খোলাখুলি বলছে: এখানে একটি রহস্য আছে, যা আপনারা পরে জানবেন। আর তা জানা গেছে।

সূত্র U.S. Naval Observatory – *Explanatory Supplement* (light-travel time)

68 আপনাদেরই মতো জাতি

আর যমীনে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, আর নিজের দুই ডানায় উড়ে এমন কোনো পাখিও নেই, যারা আপনাদেরই মতো এক একটি জাতি নয়

সূরা আনআম — আয়াত ৩৪

প্রাণীরা বিক্ষিপ্ত কিছু ব্যক্তি নয়, বরং সুসংগঠিত সমাজ

সহজ কথায়

কুরআন প্রাণীদের **"জাতি"** বলেছে — আর জাতি মানে এমন একটি দল, যার নিজস্ব নিয়ম আছে, ভাষা আছে, রীতি আছে। আর বলেছে, তারা "আপনাদেরই মতো"। আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করছে, প্রাণীদের সমাজ অত্যন্ত সুসংগঠিত।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পিঁপড়া আর মৌমাছির দলবদ্ধ জীবন প্রাচীনেরা লক্ষ করেছিলেন; অ্যারিস্টটল তো তাদের মানুষের সঙ্গে এক শ্রেণিতেই রেখেছিলেন। কিন্তু সবটাই রয়ে গেল বাইরের বর্ণনা, যার পুরোটাকে ফিরিয়ে দেওয়া হতো একটি অপরিবর্তনীয় সহজাত প্রবৃত্তির দিকে: শেখা কোনো ভাষা নেই, হস্তান্তরিত কোনো সংস্কৃতি নেই, আঞ্চলিক কোনো উপভাষা নেই। আর পশু ও মানুষের ব্যবধান ছিল চূড়ান্ত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

প্রাণী-আচরণ বিজ্ঞান সত্যিকারের সমাজের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে: পিঁপড়া ও মৌমাছির মধ্যে কঠোর শ্রমবণ্টন; তিমি ও ডলফিনের জটিল যোগাযোগ-ভাষা, যার **আঞ্চলিক উপভাষা** পর্যন্ত আছে; শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে শিখে শিখে হস্তান্তরিত সংস্কৃতি; পাখিদের সুসংগঠিত পরিযান ও পালাবদল করা নেতৃত্ব; এমনকি পাতাকাটা পিঁপড়ার "কৃষি"-ব্যবস্থা, যারা মাটির নিচে খামারে ছত্রাকের চাষ করে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

মুজিযা দুটি শব্দে। "**জাতি**": আরবিতে এটি অভিন্ন স্বার্থে বাঁধা সুসংগঠিত দল, নিছক পশুপাল নয়। আর "**আপনাদেরই মতো**": অর্থাৎ নিজস্ব নিয়মওয়ালা সমাজ হওয়ায় আপনাদের মতো — বুদ্ধি ও শরিয়তি দায়িত্বে আপনাদের মতো নয়। অথচ সেদিন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান প্রাণীর সংস্কৃতি বা ভাষা মানতে অস্বীকার করত, একে অবৈজ্ঞানিক মানবারোপ গণ্য করত — তারপর প্রমাণের সামনে পিছু হটেছে। আর "নিজের **দুই ডানায়** উড়ে" কথাটি লক্ষণীয় নির্দিষ্টকরণ, কেননা তা দুই ডানা ছাড়া যা ওড়ে তাকে বাদ দেয়।

সূত্র Hölldobler & Wilson – *The Ants*, 1990 · Frans de Waal – *Are We Smart Enough...*, 2016

প্রাণিবিজ্ঞান

69

দুর্বলতম ঘর... আর স্ত্রী মাকড়সা

যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মতো — সে একটি ঘর বানিয়ে নিল; আর নিশ্চয়ই সব ঘরের মধ্যে দুর্বলতম হলো মাকড়সার ঘর

সূরা আনকাবুত — আয়াত 41

মাকড়সার ঘর

- স্ত্রীটি একাই তা বানায়
- পুরুষটি বানায় না
- কখনো পুরুষটিকেই খেয়ে ফেলে
- নিজের বাচ্চা খেয়ে ফেলে
- আদৌ নিরাপত্তা নেই যে ঘরে

তার সুতো ইস্পাতের চেয়ে শক্ত... আর তার ঘর সবচেয়ে দুর্বল

দুর্বলতা সুতোয় নয়, এই "ঘরের" ভেতরকার সম্পর্কে

সহজ কথায়

আমরা মাকড়সার যে ঘর দেখি, তা বানায় **পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী মাকড়সা**; পূর্ণবয়স্ক পুরুষের তাতে কোনো অংশ নেই। আর তা দুর্বলতম ঘর এ কারণে নয় যে তার সুতো দুর্বল — বরং এ কারণে যে তা **মমতাহীন, নিরাপত্তাহীন একটি ঘর**: স্ত্রী মাকড়সা তার সঙ্গীকে খেয়ে ফেলতে পারে, বাচ্চাদেরও।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মাকড়সা প্রতিটি ঘরের চেনা প্রাণী, আর তার জাল দুর্বলতার প্রকাশ্য উদাহরণ। কিন্তু জাল কে বোনে — পুরুষ না স্ত্রী — এই পার্থক্য, আর জালের ভেতরে যে হত্যাযজ্ঞ চলে, তা জানা ছিল না; এসব এমন খুঁটিনাটি, যা কেবল সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণেই ধরা পড়ে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

শিকারের যে জাল আমরা দেখি, তার বিপুল অধিকাংশই বোনে **পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী মাকড়সা**; ছোট অবস্থায় পুরুষ-স্ত্রী দুইই সুতো কাটে, কিন্তু পুরুষ পূর্ণবয়স্ক হলে অধিকাংশ প্রজাতিতে সে শিকারের জাল বোনা ছেড়ে দেয় এবং স্ত্রীর খোঁজে ঘুরে বেড়ানো ভবঘুরে হয়ে যায়। কয়েক ডজন প্রজাতিতে স্ত্রী মাকড়সা মিলনের পর পুরুষটিকে মেরে খেয়ে ফেলে, আর অন্য কিছু প্রজাতিতে বাচ্চারা মাকে খায়, কিংবা মা বাচ্চাদের। আর সুতোটি নিজে পরিচিত সবচেয়ে মজবুত উপাদানগুলোর একটি: ওজনের হিসাবে ইস্পাতের চেয়েও শক্ত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুর্বলতা যদি সুতোর মজবুতিতে হতো, তবে বিজ্ঞান এই বক্তব্য খণ্ডন করে দিত, কেননা প্রমাণিত যে মাকড়সার সুতো প্রকৃতির সবচেয়ে দৃঢ় বস্তুগুলোর একটি। কিন্তু আয়াত বলছে **ঘরের** কথা, সুতোর কথা নয়; আর আরবিতে ঘর মানে পরিবার, আশ্রয় ও নিরাপত্তা। পুরো প্রসঙ্গটিই **এমন এক নষ্ট সম্পর্ক নিয়ে, যা তার ধারককে কোনো উপকারেই আসে না**। কাজেই বর্ণনাটি সামাজিকভাবে নিখুঁত, বস্তুগতভাবে নয়। আর তা নিশ্চিত করে ক্রিয়াপদটির স্ত্রীলিঙ্গ রূপ: "**ইত্তাখাযাত** বাইতান" — ঘরটি সে-ই বানিয়েছে, পুরুষ নয়।

সূত্র Foelix – *Biology of Spiders* · Vollrath & Knight (2001), Nature 410

অণুজীববিজ্ঞান

70

এক ডানায় রোগ, অন্য ডানায় আরোগ্য

আপনাদের কারো পানীয়ে মাছি পড়লে তিনি যেন তা পুরোপুরি ডুবিয়ে দেন, তারপর তুলে ফেলেন; কেননা তার এক ডানায় রোগ আর অন্যটিতে আরোগ্য আছে

বর্ণনা করেছেন বুখারি — সহিহ

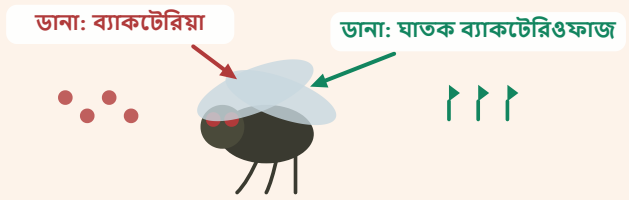

ব্যাকটেরিওফাজ (Bacteriophages): যে ভাইরাস কেবল ব্যাকটেরিয়াই মারে

1915 সালে আবিষ্কৃত — আজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত

ব্যাকটেরিওফাজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশিসংখ্যক জীব, আর তাদের একমাত্র কাজ ব্যাকটেরিয়া মারা

সহজ কথায়

মাছি জীবাণু বহন করে — এটা জানা কথা। কিন্তু হাদিস আরেকটি কথা বলছে: তার সঙ্গে **ঐ জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলার জিনিসও** আছে। আর বিজ্ঞান সত্যিই এমন অণুজীবের সন্ধান পেয়েছে, যাদের একমাত্র কাজ ব্যাকটেরিয়া শিকার করা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্বই জানা ছিল না — 1676 সালে লিউয়েনহুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আগে তা কেউ দেখেনি। কাজেই মাছির বহন করা "রোগ"-এর কথা জীবাণুতত্ত্বের হাজার বছর আগের। আর তার সঙ্গে **আরোগ্য** থাকার কথাটি বোঝার মতো কোনো কাঠামোই তখন ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ব্যাকটেরিওফাজ (Bacteriophages): অতিক্ষুদ্র ভাইরাস, যারা কেবল ব্যাকটেরিয়াকেই আক্রমণ করে ও মেরে ফেলে; 1915 সালে টোর্ট এবং 1917 সালে দ্যরেল এদের আবিষ্কার করেন। এরা **পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক জীব**, আর যেখানে ব্যাকটেরিয়া বেশি সেখানেই এরা জমে — অর্থাৎ মাছির গায়ে ও তার বাসস্থানে। ঘরোয়া মাছির গায়ে এদের সত্যিই পাওয়া গেছে। আর ফাজ-চিকিৎসা আজ প্রতিষ্ঠিত একটি চিকিৎসা-শাখা, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যর্থ হলে যা কাজে লাগানো হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

হাদিস কেবল আরোগ্যের কথা বলেই থামেনি, বরং **একটি ব্যবহারিক করণীয়** দিয়েছে: পুরোপুরি ডুবিয়ে দেওয়া। এখানেই ইঙ্গিতের জায়গা — কেননা ডুবানোর কোনো অর্থই হয় না, যদি না জীবাণুনাশকটিকে কাজ করার জন্য তরলে ছাড়তে হয়। এরপর **দুই ডানার** মধ্যে পার্থক্য: একটি বহন করে ক্ষতি, অন্যটি প্রতিকার। কথা বানিয়ে বলতে বসলে এমন ভাগ কারো মাথায় আসে না; স্বাভাবিক কথা হতো "মাছিতে রোগ আছে, ওষুধও আছে"। কিন্তু দুটিকে আলাদা ডানার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া এমন নির্দিষ্টকরণ, যা পরীক্ষার যোগ্য — আর বিজ্ঞান এসে তা সত্য প্রমাণ করেছে।

সূত্র Twort (1915) · d'Hérelle (1917) – bacteriophages · Leeuwenhoek – the first sight of bacteria, 1676 · Eliava Institute, Tbilisi – phage therapy

৭১

পৃথিবীর ভূত্বক

সেই পৃথিবী, যা ফাটলে ভরা

শপথ সেই আকাশের, যা ফিরিয়ে দেয়; আর সেই পৃথিবীর, যা ফেটে যায়।

সূরা আত-তারিক — আয়াত 11-12

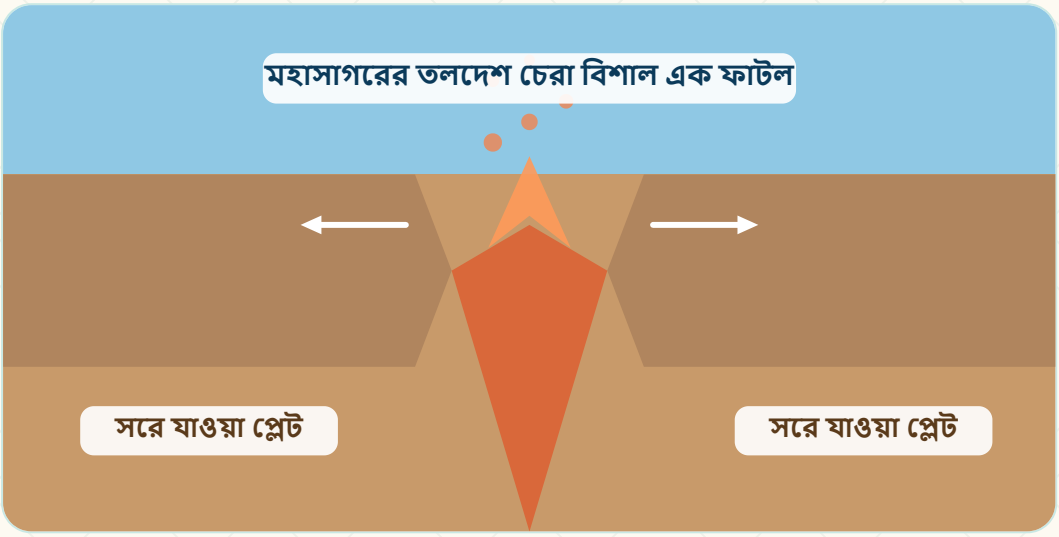

মহাসাগরের তলায় গোটা পৃথিবীকে জড়িয়ে থাকা ফাটলের এক শিকল, লম্বায় 65,000 কিলোমিটার

সহজ কথায়

পৃথিবী নিরেট, অখণ্ড কোনো গোলক নয়। তার ভূত্বক **ফাটা** — তাতে রয়েছে বিশাল সব ফাটল, যেগুলো গোটা গ্রহকে জড়িয়ে আছে, আর যেগুলো দিয়ে গভীর থেকে গলিত পাথর উঠে আসে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পৃথিবীকে ভাবা হতো একটিমাত্র নিরেট, জোড়া-লাগা বস্তু। আর গোটা পৃথিবীকে “ফাটলে ভরা” — অর্থাৎ ফাটা — বলার কোনো অর্থই তখন কারও অভিজ্ঞতায় ছিল না; চোখে পড়া ফাটল বলতে ছিল শুকনো জমির চৌচির হওয়া বা উপত্যকার খাত, এর বেশি কিছু নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

একে বলা হয় **মধ্য-মহাসাগরীয় শৈলশিরা** (Mid-Ocean Ridge): প্রায় 65,000 কিলোমিটার লম্বা আগ্নেয় ফাটলের একটি শিকল, যা টেনিস বলের সেলাইয়ের মতো গোটা গ্রহকে ঘিরে পাক খেয়ে যায়। তা থেকে গলিত পদার্থ উঠে এসে নতুন ভূত্বক গড়ে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে শব্দতরঙ্গ যন্ত্র (সোনার) দিয়েই এটি ধরা পড়ে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে শপথটি পৃথিবীকে বর্ণনা করছে **একটি সামগ্রিক, সহজাত বৈশিষ্ট্য** দিয়ে: “সেই পৃথিবী, যা ফেটে যায়” — যেমন যে জায়গার স্বভাবই গাছ জন্মানো, তাকে বলা হয় “গাছে ভরা”। এটি কোনো আকস্মিক ফাটলের কথা বলছে না, বরং ফাটলকেই গ্রহটির নিজের একটি বৈশিষ্ট্য বানিয়ে দিচ্ছে। আর ভূতাত্ত্বিক সত্যটি ঠিক এটাই: পৃথিবী এমন এক গ্রহ **যার ভূত্বক স্বভাবগতভাবেই ফাটা**, আর ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ও মহাদেশের চলাচলের মূলও সেটিই।

সূত্র Marie Tharp – the maps of the ocean floor · NOAA – the Mid-Ocean Ridge

72

সাগরতলের আগ্নেয়গিরি

প্রজ্বলিত সমুদ্র — পানির নিচে আগুন

শপথ তূর পর্বতের, আর লিখিত এক কিতাবের ... আর প্রজ্বলিত সমুদ্রের।

সূরা আত-তূর — আয়াত 1-6

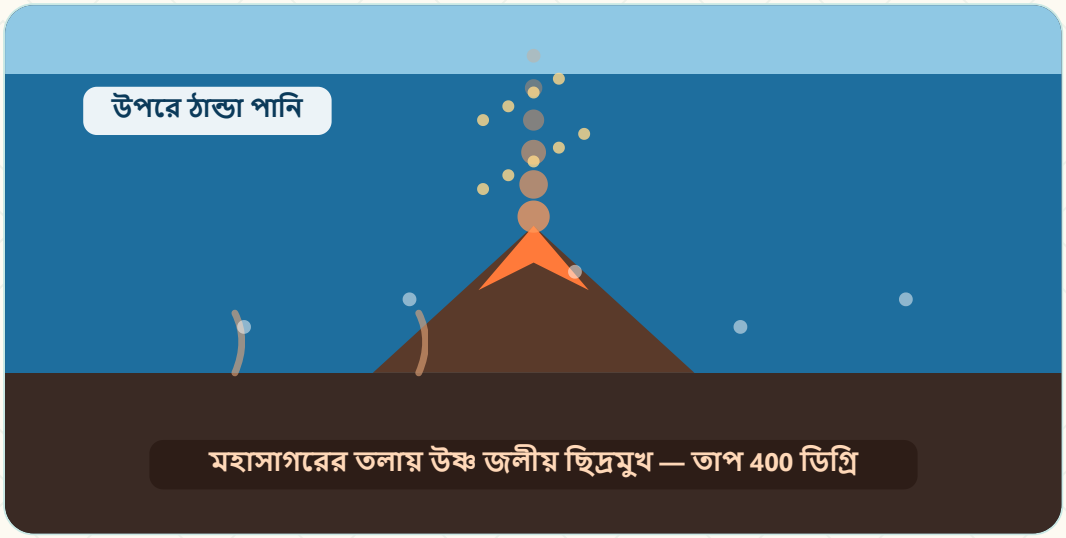

পৃথিবীর আগ্নেয় তৎপরতার ৪০ শতাংশের বেশি ঘটে সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে

সহজ কথায়

সমুদ্রের নিচে আগুন জ্বলছে! মহাসাগরের তলদেশে আছে আগ্নেয়গিরি ও ছিদ্রমুখ, যেগুলো চারশো ডিগ্রি তাপের পানি ছুড়ে দেয়। তাই সমুদ্র **প্রজ্বলিত** — নিচ থেকে আগুন ধরানো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পানি আর আগুন পরস্পর বিপরীত, এরা এক হতে পারে না — প্রত্যেক মানুষের কাছে এটি স্বতঃসিদ্ধ। সমুদ্র তো শীতলতা আর নিভিয়ে দেওয়ারই প্রতীক। সমুদ্রকে "প্রজ্বলিত" বলাটা শ্রোতাদের কাছে এমন এক দুর্বোধ্য কথা মনে হতো, বাস্তবে যার কোনো প্রতিরূপই নেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মহাসাগরের নিচে চলে গেছে বিশাল এক আগ্নেয় শৃঙ্খল, আর পৃথিবীর ৪০ শতাংশের বেশি আগ্নেয় উদ্গিরণ ঘটে পানির নিচে। 1977 সালে আবিষ্কৃত হয় **উষ্ণ জলীয় ছিদ্রমুখ**, যেগুলো 400 ডিগ্রির বেশি তাপের পানি ছুড়ে দেয়, অথচ প্রচণ্ড চাপে তা ফোটে না। আর এই আগুনগুলোর চারপাশে আছে গোটা একটি প্রাণজগৎ, যা সূর্যের আলোর উপর মোটেই নির্ভর করে না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আরবি ক্রিয়াটির অর্থ **চুলা ধরিয়ে তাকে আগুনে ভরে দেওয়া** — আর একই ধাতু থেকে এসেছে "আর যখন সমুদ্রগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে"। বর্ণনাটি আগুন ধরানোর ব্যাপারে স্পষ্ট, ভরে ওঠা বা বয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নয়। আর প্রজ্বলিত সমুদ্রের শপথটি একটি শপথমালার শেষ কড়ি — তূর পর্বত, লিখিত কিতাব, বায়তুল মামুর ও উঁচু ছাদ — অর্থাৎ তা এসেছে বাস্তব, বিদ্যমান জিনিসের প্রসঙ্গে। তাই এটি শপথ করছে উপস্থিত এক বাস্তবতার, যা মানুষ উদ্ঘাটন করেছে 1,350 বছর পরে।

সূত্র Corliss et al. (1979) – thermal springs on the Galápagos Rift

73

পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট

নিশ্চয়ই বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট — যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অচিরেই তারা জেনে যাবে।

সূরা আল-হিজর — আয়াত 95-96

মক্কায় বিদ্রূপের নেতারা অল্প সময়ের মধ্যেই একের পর এক মারা গেল

সহজ কথায়

মক্কায় কিছু প্রসিদ্ধ লোক নবী ﷺ-কে নিয়ে বিদ্রূপের নেতৃত্ব দিত ও তাঁকে কষ্ট দিত। তখন একটি আয়াত নাযিল হলো: **তাদের বিরুদ্ধে আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট**। বেশি সময় যায়নি, তারা সবাই ধ্বংস হলো, প্রত্যেকে আলাদা কারণে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এরা ছিল কুরাইশের সরদার, মর্যাদা ও সম্পদের অধিকারী, নিজেদের শক্তি ও প্রভাবের চূড়ায়। আর নবী ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায়: অবরুদ্ধ ও নির্যাতিত, না ছিল সেনাবাহিনী, না ছিল কোনো আশ্রয়। তাদের কষ্ট ঠেকানোর কোনো মানবিক উপায়ই ছিল না, ধ্বংস করা তো দূরের কথা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সিরাত ও ইতিহাসের কিতাবগুলো — যার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ইবনে হিশামের বর্ণনায় ইবনে ইসহাকের সিরাত — উল্লেখ করে যে বিদ্রূপের নেতা ছিল পাঁচজন, আর তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায় হিজরতের আগে বা তার আশপাশে খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে, এমন নানা কারণে যাদের মধ্যে কোনো মিল নেই: রোগ, মহামারি, দুর্ঘটনা, বিঁধে যাওয়া একটি কাঁটা, আর পচে যাওয়া একটি ক্ষত। এরপর তাদের কেউই আর দাওয়াতের বিরোধিতা করতে বেঁচে থাকেনি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই বাণীতে আছে **একটি নিশ্চয়তা**, কেবল দোয়া বা আশা নয়। আর নিশ্চয়তা এমন এক অঙ্গীকার, যা ভঙ্গ হতে পারে, আর তাতে সঙ্গে সঙ্গেই তার দাতা প্রতিপক্ষের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তাদের একজনও যদি বছরের পর বছর কষ্ট দিতে ও বিদ্রূপ করতে বেঁচে থাকত, তবে আয়াতটি তাদের পক্ষে নয়, তাদের বিরুদ্ধেই দলিল হয়ে দাঁড়াত। আর সবচেয়ে বড় কথা: এটি এমন এক প্রতিশ্রুতি, যা **শহরের সবচেয়ে দুর্বলদের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে** দেওয়া হয়েছিল — আর এই ধারা গোটা কুরআনজুড়েই ফিরে ফিরে আসে: "এই দল অচিরেই পরাজিত হবে আর পিঠ ফিরিয়ে পালাবে" নাযিল হয়েছিল মক্কায়, বদরের বহু বছর আগে, আর নবী ﷺ তা পাঠ করেছিলেন বদরের দিনে — এবং তা ঘটে গেল।

74

বিশ্বজগতের পরিণতি

আকাশ গুটানো হবে কাগজের মতো

সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে লিখিত দলিলের পাতা গুটানো হয়। যেভাবে প্রথম সৃষ্টি শুরু করেছিলাম, সেভাবেই তা ফিরিয়ে আনব।

সূরা আল-আম্বিয়া — আয়াত 104

বিশ্বজগৎ একটি বিন্দু থেকে ছড়িয়েছে... আর গুটিয়ে আবার বিন্দুতেই ফিরবে

সহজ কথায়

আয়াতটি বলছে, বিশ্বজগতের পরিণতি হবে **গুটিয়ে যাওয়া** — অর্থাৎ সংকুচিত হওয়া ও পেঁচিয়ে যাওয়া, যেমন আপনি একটি কাগজ পেঁচিয়ে নেন। তারপর বলছে এক আশ্চর্য কথা: এই পরিণতি হবে হুবহু **সূচনার মতোই**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

"বিশ্বজগৎ কীভাবে শেষ হবে?" — এমন কোনো প্রশ্নই তখন দিগন্তে ছিল না, কারণ মানুষের ধারণায় বিশ্বজগৎ ছিল অনাদি ও অনন্ত, যার শুরুও নেই, শেষও নেই। আর পরিণতির আকৃতির সঙ্গে সূচনার আকৃতি জোড়ার মতো কোনো কাঠামোই তখন ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে বিশ্বজগতের পরিণতির সবচেয়ে পরিচিত দৃশ্যকল্পগুলোর একটি **"মহাসংকোচন"** (Big Crunch): মহাকর্ষ প্রসারণকে হারিয়ে দেয়, আর বিশ্বজগৎ নিজের উপরেই সংকুচিত হতে হতে ফিরে যায় তার প্রথম অবস্থায় — অতি-ঘন একটি বিন্দুতে। অর্থাৎ **পরিণতি হলো সূচনার উল্টো প্রতিচ্ছবি**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

অলৌকিকতা এখানে আয়াতের দ্বিতীয় অর্ধে: "যেভাবে প্রথম সৃষ্টি শুরু করেছিলাম, সেভাবেই তা ফিরিয়ে আনব।" এই বাক্যটি একটি নিয়ম কায়েম করছে: **পরিণতির আকৃতি = সূচনার আকৃতি**। আর এর মধ্য দিয়েই তা আমাদের পরোক্ষে জানিয়ে দিচ্ছে, বিশ্বজগৎ তার শুরুতে ছিল **গুটানো** — অর্থাৎ একটি বিন্দুতে সংকুচিত — আর মহাবিস্ফোরণ মডেল ঠিক এ কথাই বলে। একটিমাত্র আয়াত সূচনা ও পরিণতি দুটোই দিয়ে দিল, এমন এক যুগে যখন কারও মনে বিশ্বজগতের শুরুও ছিল না, শেষও ছিল না।

সূত্র Ryden – *Introduction to Cosmology* · The Big Crunch

75

পালসার

যে তারা কড়া নাড়ে আর ভেদ করে

শপথ আকাশের এবং তারিকের — রাতে যে কড়া নেড়ে আসে — আর আপনি কী জানেন, তারিক কী? তা সেই ভেদকারী তারা।

সূরা আত-তারিক — আয়াত 1-3

স্পন্দনশীল তারা: হাতুড়ির অব্যর্থ ঘায়ের মতো নিয়মিত স্পন্দন পাঠায়

সহজ কথায়

কিছু তারা এমন সংকেত পাঠায়, যা **দরজায় নিয়মিত কড়া নাড়ার মতো**: টক... টক... টক... মানুষের বানানো সূক্ষ্মতম ঘড়ির চেয়েও নিখুঁত নিয়মে। আর কুরআন এমন তারার নাম দিয়েছে "তারিক" — অর্থাৎ যে কড়া নাড়ে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের কাছে তারা ছিল নীরব, নিশ্চল আলোর বিন্দু— না শব্দ, না স্পন্দন, না ভেদ করার ক্ষমতা। আর "তারক" শব্দটি, যার অর্থ বারবার শব্দ তুলে আঘাত করা, আকাশের কোনো তারার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সে যুগের যে কোনো শ্রোতার কাছে ছিল অর্থহীন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1967 সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোসেলিন বেল মহাকাশ থেকে বিস্ময়কর নিয়মে পুনরাবৃত্ত বেতার সংকেত ধরেন — এতটাই নিয়মিত যে দলটি প্রথমে ভেবেছিল এগুলো বুদ্ধিমান কোনো সত্তার বার্তা, আর নাম দিয়েছিল LGM-1। পরে দেখা গেল, এগুলো **স্পন্দনশীল নিউট্রন তারা** (Pulsars): বিস্ফোরিত তারার অবশেষ, যা প্রায় প্রতি সেকেন্ডে একবার নিজ অক্ষে ঘোরে — দ্রুততমগুলো সেকেন্ডে কয়েকশ বার — আর বাতিঘরের মতো মহাশূন্য ঝেঁটিয়ে যাওয়া দুটি রশ্মি ছুড়ে দেয়। আর তাদের সংকেতকে শব্দে রূপান্তর করা হলে তা হয় হুবহু **নিয়মিত কড়া নাড়া**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুটি শব্দ একসঙ্গে আর কোনো অবকাশ রাখে না: "তারিক" = যে বারবার কড়া নাড়ার শব্দ তোলে, আর "সাকিব" = যে ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায়। স্পন্দনশীল তারা আক্ষরিক অর্থেই দুটি বর্ণনাই মেলায়: তার সংকেত নিয়মিত কড়া নাড়া, আর তা হাজার হাজার আলোকবর্ষ ভেদ করে ছায়াপথের ধূলি পেরিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। বরং শপথের পরপরই এল একটি বিস্ময়সূচক প্রশ্ন: "আর আপনি কী জানেন, তারিক কী?" — অর্থাৎ এটি এমন কিছু, **যা জানার কোনো উপায় আপনার নেই**। আর তা-ই ছিল, 1967 সাল পর্যন্ত।

সূত্র Hewish, Bell et al. (1968) – a rapidly pulsating radio source

৭৬ যে আকাশ বোনা পথে ভরা

শপথ বোনা পথে ভরা আকাশের।

সূরা আয-যারিয়াত — আয়াত 7

বিশ্বজগতের বিরাট মানচিত্র: ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছায়াপথ নয়, বরং সুতো ও গিঁটের বোনা জাল

সহজ কথায়

আপনি যদি খুব দূর থেকে গোটা বিশ্বজগতের দিকে তাকাতেন, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তারা দেখতেন না। দেখতেন **কাপড়ের বুনন বা সুতোর জালের** মতো কিছু: ছায়াপথের লম্বা লম্বা সুতো, আর তাদের মাঝে বিশাল কালো শূন্যতা। আর আরবি "হুবুক" শব্দের অর্থ: **পথে ভরা নিপুণ বুনন**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষের কাছে আকাশ ছিল মসৃণ একটি গম্বুজ, যাতে আলোর বিন্দু বসানো — কোনো গঠন নেই, আকার নেই, বিন্যাস নেই। বিশ্বজগতের আদৌ একটি "সামগ্রিক আকৃতি" থাকতে পারে, এ প্রশ্নই তখন ওঠেনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে মানমন্দিরগুলো লক্ষ লক্ষ ছায়াপথের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করেছে (SDSS প্রকল্প ও 2dF জরিপ), আর ফল এল বিস্ময়কর: ছায়াপথগুলো এলোমেলোভাবে ছড়ানো নয়, বরং সাজানো আছে **"মহাজাগতিক জালে" (Cosmic Web)** — ছায়াপথের বিশালাকার সুতো ও দেয়াল, যা ঘিরে রেখেছে প্রকাণ্ড ফাঁকা শূন্যতা। আর তাতে যে ছবি দাঁড়ায়, তা বিস্ময়কর রকম বোনা কাপড়ের মতো।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"হুবুক" হলো "হিবাক"-এর বহুবচন, আর আরবি অভিধানে এর অর্থ: নিপুণ বুননে বোনা কোনো জিনিসের ভেতরের পরস্পর-জড়ানো পথ — যেমন পানির ঢেউয়ের দাগ কিংবা বালির ভাঁজ। আর আজ ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষাটিও ঠিক এটিই: Filaments, অর্থাৎ **সুতো**। চৌদ্দ শতাব্দী পরে এত বিরল ও সুনির্দিষ্ট একটি অর্থে আরবি শব্দের সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষার এই মিল কাকতালীয়ভাবে ঘটার মতো জিনিস নয়।

সূত্র Bond, Kofman & Pogosyan (1996) – the cosmic web, Nature 380 · Sloan Digital Sky Survey

77

কৃষ্ণগহ্বর

যারা লুকায়, ছোটে আর ঝেঁটিয়ে নেয়

আমি শপথ করছি লুকিয়ে যাওয়া তারাগুলোর — যারা ছোটে ও ঝেঁটিয়ে নেয়।

সূরা আত-তাকভীর — আয়াত 15-16

কৃষ্ণগহ্বর মহাজাগতিক ঝাড়ুর মতো তার চারপাশের গ্যাস ও তারা গিলে ফেলে

সহজ কথায়

মহাশূন্যে এমন কিছু বস্তু আছে, যাদের মধ্যে তিনটি গুণ: তারা **অদৃশ্য হয়ে যায়**, দেখা যায় না; প্রচণ্ড গতিতে **ছোটে**; আর চারপাশের সবকিছু **ঝেঁটিয়ে নিয়ে** গিলে ফেলে। আল্লাহ এখানে ঠিক এই তিনটি গুণেরই শপথ করছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

গোটা দুনিয়ায় **অদৃশ্য** কোনো মহাজাগতিক বস্তুর ধারণাই ছিল না। বস্তু হয় দেখা যায়, তাই তার অস্তিত্ব আছে; নয়তো দেখা যায় না, তাই তার অস্তিত্ব নেই। আকাশে এমন বিশাল কিছু থাকতে পারে, যা কোনো চোখ কখনো দেখে না, অথচ চারপাশের সবকিছু গিলে ফেলে — এ কারও কল্পনায়ই আসেনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কৃষ্ণগহ্বর: এমন বস্তু, যার ঘনত্ব এতটাই অকল্পনীয় যে আলো পর্যন্ত তার হাত থেকে ছাড়া পায় না; তাই স্বভাবতই সেগুলো **সম্পূর্ণ অদৃশ্য**। সেগুলো নিজ নিজ ছায়াপথে ঘোরে ও ছুটে চলে, আর গ্যাস, ধূলি ও তারা টেনে নিয়ে গিলে ফেলে। প্রথম কৃষ্ণগহ্বরের সরাসরি ছবি তোলা হয় 2019 সালে (M87 ছায়াপথে), আর এগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণের কাজ 2020 সালে নোবেল পুরস্কার পায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

তিনটি শব্দই বিস্ময়কর রকম সূক্ষ্ম: "খুন্নাস" এসেছে খানাসা থেকে, অর্থ **লুকিয়ে যাওয়া ও গুটিয়ে যাওয়া**; "জাওয়ার" অর্থ **ছুটে চলা, গতিশীল**; "কুন্নাস" এসেছে কানাসা থেকে, অর্থ **চারপাশের সব জড়ো করে গিলে ফেলা** (এ থেকেই এসেছে ঝাড়ুর আরবি শব্দ, আর সেই গর্তের শব্দও, যাতে হরিণ গিয়ে লুকায়)। দুই আয়াতে তিনটি গুণ, আর সবগুলোই খাটে একটিমাত্র জিনিসের উপর, যা বিংশ শতাব্দীর আগে জানাই ছিল না। আর মনে রাখুন, কুরআনে শপথ কেবল মহান কোনো কিছুরই করা হয়।

সূত্র Event Horizon Telescope (2019) – the first image of M87* · Nobel Prize in Physics 2020

78

পৃথিবীর গঠন

পৃথিবী তার ভার বের করে দেয়

❖ যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী তার ভার বের করে দেবে। ❖

সূরা আয-যিলযাল — আয়াত 1-2

ভূমিকম্প ও পাতের নড়াচড়াই ধাতু আর তেলকে আমাদের নাগালে তুলে এনেছে

সহজ কথায়

আজ আমরা যে সোনা, ধাতু ও তেল উত্তোলন করি, তার সবই ছিল পৃথিবীর গভীরে পোঁতা। যা সেগুলোকে পৃষ্ঠের কাছে তুলে এনেছে তা হলো **ভূমিকম্প ও পৃথিবীর নড়াচড়া** — লক্ষ লক্ষ বছর ধরে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ভূমিকম্প ছিল নিছক বিপর্যয়: ধস, ভূমি দেবে যাওয়া আর মৃত্যু। কেউ একে কোনো উপকারের সঙ্গে, কিংবা কোনো কল্যাণ বের করে আনার সঙ্গে মেলায়নি। আর "তার ভার" কথাটি যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের ভাণ্ডার বোঝায়, শ্রোতাদের কাছে তার কোনো স্পষ্ট অর্থ ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পৃথিবীর অধিকাংশ অর্থনৈতিক খনি অবস্থিত **টেকটনিক পাতের সীমানায়** এবং ভূকম্পন ও আগ্নেয় তৎপরতার অঞ্চলে। পাতের নড়াচড়াই ধাতুসমৃদ্ধ শিলাকে গভীর থেকে ভূত্বকে ঠেলে তোলে, আর উত্তপ্ত তরলই সোনা ও তামাকে শিরায় শিরায় ঘনীভূত করে। এই তৎপরতা না থাকলে পৃথিবীর সব ভাণ্ডার চিরকাল আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যেত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি এমন দুটি ঘটনাকে জুড়ে দেয় যা সাধারণ বুদ্ধি জোড়ে না: প্রকম্পন থেকে ভার বেরিয়ে আসা। খনিবিদ্যা ঠিক এ কথাই স্থির করে। আর "ভার" শব্দটি বিস্ময়করভাবে নিখুঁত: মূল্যবান ধাতু — সোনা ও প্লাটিনাম — **মৌলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঘন**, এবং লোহার সঙ্গে এদের বাঁধন গভীর; তাই যেদিন পৃথিবীর স্তরগুলো আলাদা হলো, এরা লোহার পিছু পিছু কেন্দ্রে নেমে গেল আর ভূত্বককে প্রায় শূন্য করে রেখে গেল। কোনো শক্তি ওপরে না তুললে এরা আমাদের কাছে পৌঁছায় না। যে ভৌত বৈশিষ্ট্য এদের আলাদা করে, সেই নামেই এদের ডাকা হলো।

ভাইরাসবিজ্ঞান

79 একটি মশা, আর তার ঊর্ধ্বে যা আছে

নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা কিংবা তার ঊর্ধ্বে যা আছে, তার দৃষ্টান্ত দিতে

সূরা বাকারা — আয়াত 26

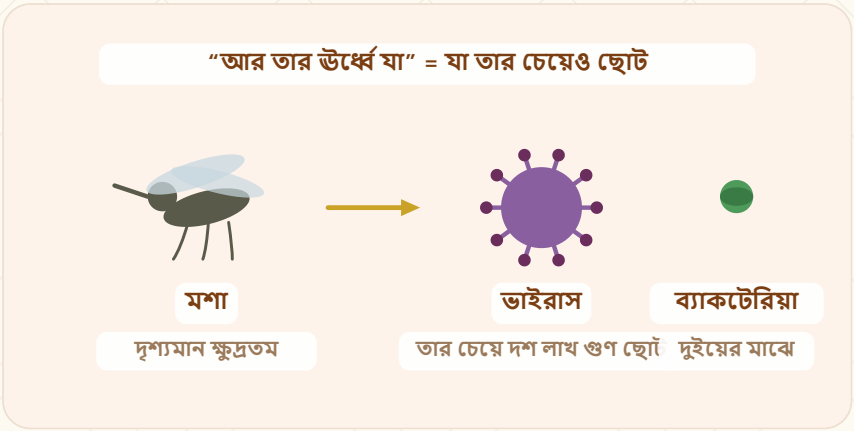

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মাপে মশা এক দৈত্য

সহজ কথায়

কুরআন দৃষ্টান্ত দিয়েছে মানুষ চোখে দেখতে পায় এমন সবচেয়ে ছোট জিনিস দিয়ে — মশা — তারপর বলেছে: **"আর তার ঊর্ধ্বে যা আছে"**। আরবিতে "ফাওক" (ঊর্ধ্বে) শব্দটি **ক্ষুদ্রতায় আরও এগিয়ে যাওয়া** অর্থেও আসে, অর্থাৎ: আর তার চেয়েও যা ছোট।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মশাই ছিল সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতার শেষ সীমা: চোখ যাকে দেখতে পায় এবং যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদা করে চিনতে পারে, এমন ক্ষুদ্রতম প্রাণী। এর চেয়ে ছোট প্রাণের কথা কল্পনাতেই আসত না, কেননা যা দেখা যায় না তার অস্তিত্ব জানা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত অবস্থা এমনই ছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মশা তুলনামূলকভাবে বিশাল এক প্রাণী: লম্বায় প্রায় 6 মিলিমিটার। কেবল তার শরীরেই বাস করে **লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া**, আর তার গায়ে থাকে ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে শতগুণ ছোট ভাইরাস। দেখা গেছে, একটিমাত্র মশার গড়ন অত্যন্ত জটিল: শত শত লেন্স দিয়ে গড়া পুঞ্জাক্ষি, এমন এক শুঁড় যাতে ছেদন, শোষণ আর রক্ত জমাট বাঁধতে না দেওয়ার উপাদান ঢোকানোর জন্য ছয়টি আলাদা যন্ত্র আছে, আর এমন ডানা যা সেকেন্ডে 600 বার ঝাপটায়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

প্রসঙ্গই ফয়সালা করে দেয়। আয়াতটি এসেছে এ কথা বোঝাতে যে, আল্লাহ **ক্ষুদ্র** বস্তু দিয়ে দৃষ্টান্ত দিতে লজ্জা করেন না — মাছি ও মাকড়সার উল্লেখ নিয়ে যারা ঠাট্টা করেছিল তাদের জবাবে। কাজেই প্রসঙ্গের সঙ্গে মেলে এমন অর্থ হলো: আর তার চেয়ে **ক্ষুদ্রতায় আরও গভীরে** যা আছে, তা দিয়েও নয়। আর এই ব্যবহার বিশুদ্ধ আরবি, যেমন বলা হয় "মূর্খতায় এ লোক তার ঊর্ধ্বে"। কাজেই আয়াতটি পরোক্ষভাবে প্রমাণ করছে, চোখে দেখা ক্ষুদ্রতম জিনিসের চেয়েও ছোট সৃষ্টি আছে — এমন এক সময়ে, যখন ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের শেষ সীমাই ছিল মশা।

সূত্র Leeuwenhoek (1674-1676) – the microscopic world

৪০

ভূতত্ত্ব

লুতের জাতি — যার উপরটা করা হলো নিচ

> যখন আমার আদেশ এল, আমি তার উপরটাকে নিচ করে দিলাম, আর তার উপর বর্ষণ করলাম স্তরে স্তরে সাজানো পোড়ামাটির পাথর।
>
> সূরা হুদ — আয়াত ৪২

যে অঞ্চল দেবে গেল ও উল্টে গেল, তারপর তীব্র লবণাক্ত পানিতে ডুবল

সহজ কথায়

আয়াতটি বলছে, লুতের জাতির শহর **উল্টে গিয়েছিল ওলটপালট হয়ে**, তারপর তার উপর নেমেছিল একটির উপর একটি সাজানো পাথর। ভূতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, ঠিক ওই অঞ্চলেই এটি কীভাবে ঘটে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

দেবে যাওয়া আর উল্টে যাওয়াকে বোঝা হতো নিছক অদৃশ্য শাস্তি হিসেবে, কোনো প্রাকৃতিক কার্যপ্রণালী ছাড়াই। জানা ছিল না যে ওই অঞ্চল বিশাল এক ভূ-চ্যুতির উপর পড়েছে, কিংবা তার নিচে জমে আছে গ্যাস, খনিজ আলকাতরা আর গন্ধক।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মৃত সাগরের অঞ্চল পড়েছে **মৃত সাগরের রূপান্তর-চ্যুতির** উপর — পৃথিবীর সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকম্প-চ্যুতিগুলোর একটি — আর এটিই এই গ্রহের সবচেয়ে নিচু শুকনো ভূমি। অঞ্চলটি প্রাকৃতিক আলকাতরা, গন্ধক ও দাহ্য গ্যাসে সমৃদ্ধ। গবেষকরা মনে করেন, প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পে **মাটি তরল হয়ে দেবে যায়** এবং তার স্তরগুলো উল্টে যায়, সেই সঙ্গে জ্বলন্ত পদার্থ ছিটকে উঠে অঞ্চলটির উপর নেমে আসে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

তিনটি শব্দই গোটা বর্ণনাটি বহন করছে। "**আমি তার উপরটাকে নিচ করে দিলাম**": স্তরগুলোর পূর্ণ উল্লম্ব উল্টে যাওয়া, নিছক ভেঙে ফেলা নয় — আর দেবে যাওয়া ও উল্টে যাওয়ার ভূতাত্ত্বিক বর্ণনা ঠিক এটিই। "**সিজ্জিল**": এমন একটি শব্দ যা পাথর আর শক্ত হয়ে যাওয়া কাদা, দুটিকেই ধরে রাখে। আর "**মানদুদ**": অর্থাৎ একটির উপর আরেকটি স্তরে স্তরে ঠাসা — ওই অঞ্চলের স্তরীভূত পাললিক শিলার এ এক নিখুঁত বর্ণনা। অর্থাৎ পাঠটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাকৃতিক কার্যপ্রণালীর বর্ণনা দিচ্ছে, কোনো ভাসা-ভাসা কল্পচিত্র নয়।

সূত্র Bab edh-Dhra – the southern Dead Sea plain · The Dead Sea – the lowest land on earth

প্রত্নতত্ত্ব

৪১ ইরাম, স্তম্ভের নগরী — চাপা পড়া শহর

আপনি কি দেখেননি, আপনার রব আদ জাতির সঙ্গে কী করেছিলেন? স্তম্ভের অধিকারী ইরাম, যার মতো আর কিছু দেশে-দেশে সৃষ্টি করা হয়নি?

সূরা আল-ফাজর — আয়াত 6-8

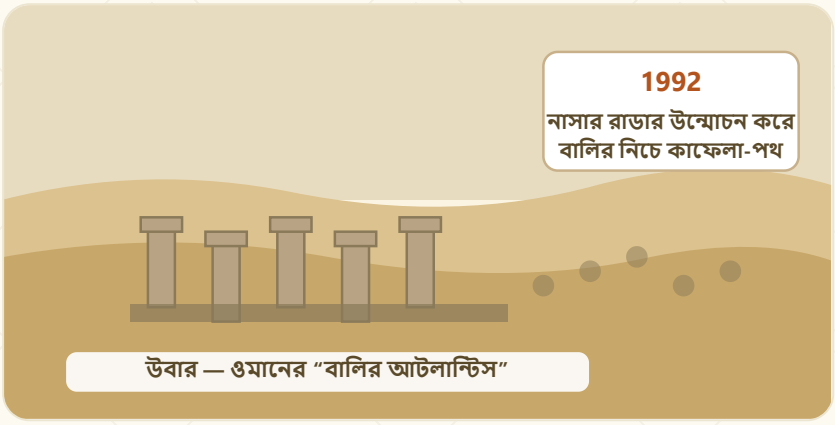

উঁচু বুরুজওয়ালা এক দুর্গ, হাজার হাজার বছর পর যা রুবউল খালির বালির নিচ থেকে বেরিয়ে এল

সহজ কথায়

কুরআন এমন এক মহানগরীর কথা বলেছে যার **স্তম্ভ** ছিল, যার মতো কিছু আর নির্মিত হয়নি, আর বলেছে সেটি ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ একে কিংবদন্তি বলেই গুনে এসেছে... যতক্ষণ না উপগ্রহের রাডার রুবউল খালির বালির নিচে এমন এক চাপা পড়া জনপদ দেখাল, যা মরুভূমি লুকিয়ে রেখেছে বলে কেউ ভাবেইনি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

রুবউল খালিতে অন্তহীন বালু ছাড়া কিছুই ছিল না। পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা "আদ" ও "ইরাম"-কে আরবদের কিংবদন্তির মধ্যেই গুনতেন, কারণ তাদের কোনো চিহ্ন ছিল না, অন্য কোনো সূত্রেও উল্লেখ ছিল না। আর মরুভূমি এমন কোনো গোপন কথা রাখে না যা তার উপরিতল থেকে দেখা যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1992 সালে নিকোলাস ক্ল্যাপের নেতৃত্বে একটি দল নাসার মহাকাশযানের রাডার-ছবি ব্যবহার করে, আর বালির নিচে ফুটে ওঠে **প্রাচীন কাফেলা-পথ, যেগুলো একটিমাত্র বিন্দুতে এসে মিলেছে** — ওমানের জোফার প্রদেশের **শিসর**-এ। খননে বেরিয়ে আসে অষ্টভুজ এক দুর্গ, যার **উঁচু বুরুজ** ছিল, আর নিচের একটি চুনাপাথরের গর্তে ধসে পড়া এক শহরের চিহ্ন। বিশ্বের সংবাদপত্র খবরটি ছাপে "উবার: বালির আটলান্টিস" নামে। কিন্তু সেটি সংবাদপত্রের শিরোনাম, প্রত্নতাত্ত্বিকদের রায় নয়: শিসরকে ইরাম বলে চিহ্নিত করা প্রমাণিত হয়নি, আর কুরআন যে শহরের কথা বলেছে তার অবস্থান আজও অজানা।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কুরআনের বর্ণনা শহরটিকে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে আলাদা করেছে: "**স্তম্ভের অধিকারী**" — অর্থাৎ থাম বা উঁচু বুরুজ। এটি যেকোনো শহরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়; আরব উপদ্বীপের জনপদ ছিল মাটির ঘর আর তাঁবু। তারপর যোগ করেছে: "**যার মতো আর কিছু দেশে-দেশে সৃষ্টি করা হয়নি**" — অর্থাৎ তার স্থাপত্যের অনন্যতা। আর বালির নিচ থেকে সত্যিই উঁচু বুরুজ বেরিয়েছে, যদিও শিসরই যে ইরাম, তা এখনো প্রমাণিত নয়। সবচেয়ে বড় কথা, কুরআন একে বলেছে **বাস্তব ইতিহাস** হিসেবে, কিংবদন্তি হিসেবে নয় — এমন এক সময়ে যখন এর পক্ষে কারও কোনো প্রমাণ ছিল না, আর চৌদ্দ শতাব্দী ধরে এটিই ছিল তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ, যতক্ষণ না রাডার এল।

সূত্র Nicholas Clapp – *The Road to Ubar*, 1998 · NASA radar imagery and the search for Ubar